Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি পরিবার ব্যবস্থা: চ্যালেঞ্জ ও সমাধান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে জুনাইদা মুন

রোলঃ 227021138228

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি পরিবার ব্যবস্থা: চ্যালেঞ্জ ও সমাধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে জুনাইদা মুন

রোলঃ 227021138228

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামি পরিবার ব্যবস্থা: চ্যালেঞ্জ ও সমাধান " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে উম্মে জুনাইদা মুন, আইডিঃ 227021138228 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামি পরিবার ব্যবস্থা: চ্যালেঞ্জ ও সমাধান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

উম্মে জুনাইদা মুন

আইডিঃ 227021138228

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

অবতরণিকা......6

পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় আলোকিত পরিবার:......9

মুসলমানের পরিবার কেমন হবে:......5

ধূমপান বর্জন করুন: 12

ঘরে কুকুর রাখা থেকে বিরত থাকুন:......13

বাড়ি-ঘরে কারুকার্য করা থেকে বিরত থাকুন:......15

আদর্শ দ্বীনি পরিবার : 19

দ্বীনি স্ত্রীর দায়িত্ব : 19

সন্তানকে দ্বীন শিক্ষা:......22

পারিবারিক কথোপকথন কেন জরুরি: 28

পরিবার প্রতিরক্ষা:......35

পুরুষের ভূমিকা:......38

ইসলামিক পরিবারের রূপরেখা:......44

হালাল পন্থায় জীবিকা নির্বাহ:......44

কথা বলার দক্ষতা: 45

পরিবার গঠনের নেপথ্যে যারা: 50

শিক্ষা ও চর্চার ধারাবাহিকতা: 52

তত্ত্বসূত্র: 56

بسم الله الرحمن الرحيم

অবতরণিকা

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ

পরিবারের পরিশুদ্ধতা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় একটি আমানত। বিরাট এক দায়িত্ব। আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী এ আমানত রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর ওপর আবশ্যক। পরিবারকে সর্বপ্রকার মন্দ ও নিকৃষ্ট বিষয় থেকে মুক্ত রাখা-এ আমানত রক্ষারই অন্যতম অংশ।

মদীনার পড়ন্ত বিকেল। জিহাদের সফর থেকে ফিরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগে মসজিদে যেতেন। দু রাকআত নামাজ পড়ে সবার আগে যেতেন কলিজার টুকরা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে। এরপর স্ত্রীদের ঘরে ঘরে যেতেন। একবার জিহাদ থেকে ফিরে চোখের মণির সাথে দেখা করতে এলেন নবিজি। হাত-পা ধুলোমাখা, পোশাকে-মুখে ময়লা-মাটি। কপাল বেয়ে ঝরছে ঘাম। বহুদিন পরে পিতাকে দেখে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা কাঁদতে কাঁদতে বাবার কপালে-চোখে চুমুদিতে লাগলেন।

কাঁদছিস কেন রে, মা?

আব্বা, আপনার অবস্থা দেখে কাঁদছি। রোদে পুড়ে কালো হয়ে গেছেন। কাপড়চোপড় মলিন-বিবর্ণ হয়ে গেছে।

মা রে, কাঁদিস না। আল্লাহ তাআলা তোর বাবাকে এমন দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাকে তিনি একদিন জমিনের বুকে সমস্ত কাঁচা-পাকা ঘর আর পশমের তাঁবুর মাঝে প্রবেশ করিয়ে তবেই ছাড়বেন। কেউ এই দ্বীন গ্রহণ করে সম্মানিত হবে,

কেউ গ্রহণ না করে বেইজ্জত হবে। এমনকি যেখানে যেখানে রাত পৌঁছে, সেখানে এই দ্বীন গিয়ে পৌঁছবে।

নবিজির স্বপ্ন: তাঁর দ্বীন প্রতিটি ঘরে পৌঁছুবে। এই স্বপ্ন নবিজিকে ঘুমোতে দিত না। রাতের পর রাত। দিনের পর দিন। তেইশ বছরের জীবনে তিনি আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক যে এক লাখ মডেল মানুষ, হাজার হাজার মডেল পরিবার, শত শত মডেল সমাজ, একটা মডেল অর্থব্যবস্থা, একটা মডেল বিচারব্যবস্থা, একটা মডেল রাষ্ট্র তৈরি করে গেলেন, সেই মডেল কপি হতে হতে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে থাকা ঘরেও পৌঁছে যাবে দাওয়াত-জিযিয়া-জিহাদের দ্বারা। দুনিয়ার দোযখ এবং পরকালের দোযখ থেকে শেষ বনী আদমটাও বেঁচে যাবে। কিন্তু কারা করবে মডেল কপি?

করবে এক একটি ইসলামী পরিবার।এক-একটি পরিবারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদম সন্তান মিলেই হবে বৃহত্তর শক্তিশালী উম্মাহ।

আমাদের কাছে এ পৃথিবীটা একটি শস্যক্ষেত্র। এখানে আমরা পরকালের জন্য ফসল ফলাব। একজন কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই সোনালি ফসল জন্মে। ঠিক তেমনি আমাদের এই দুনিয়ার কাজগুলো পরকালে আমাদের জন্য কল্যাণকর ফলাফল বয়ে আনবে।

মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এই কথাটি খুব সুন্দর করে আমাদের জানিয়েছেন-

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَه٪

অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে, তা দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে, তাও দেখতে পাবে।[১]

একজন সত্যিকারের মুসলিম এই পৃথিবীতে বাস করলেও তার হৃদয় থাকবে পরকালে নিবিষ্ট। কারণ সে জানে, এই পৃথিবীটা ক্ষণস্থায়ী। তাই সে সর্বদা শাশ্বত ও চিরস্থায়ী জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত থাকে।পরকালের জীবনের প্রস্তুতির একটি রুপরেখাই হল ইসলামিক পরিবার।যেখানে সকলে মিলে ফিকির করবে সুন্নাতের,আমল করবে কুরআনের এবং প্রস্তুতি নিবে আখিরাতের।ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন এই লিখাকে বরকতময়, উপকারী হিসেবে কবুল করে নেন। এতে ইখলাস দান করেন। জীবন ও মরণে এই লিখার উসিলায় আমাকে উপকৃত করেন। সেই সঙ্গে এর পাঠককেও যেন আল্লাহ তাআলা উপকৃত হওয়ার তৌফিক দিন। এ সকল প্রার্থনা আমার একমাত্র আল্লাহর দরবারেই। কারণ, তিনিই সর্বোত্তম চাওয়ার জায়গা। সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত সত্তা তিনিই। আমাদের জন্য তিনিই যথেষ্ট এবং উত্তম কর্ম বিধায়ক। সুমহান আল্লাহ তাআলার তাওফিক ছাড়া ভালো কিংবা মন্দ কোনো কর্মের ক্ষমতা আমাদের নেই।

আল্লাহর বান্দা ও রাসুল আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর আল্লাহ তাআলা দরুদ ও সালাম বর্ষিত করুন। তাঁর ওপর বরকত নাজিল করুন। সেই সঙ্গে তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কেরাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সব মুমিনের ওপরও দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

বর্ষ: ২০,   সংখ্যা: ০৪
শাওয়াল ১৪৪৫ || এপ্রিল ২০২৪

পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় আলোকিত পরিবার:

পবিত্র কুরআনের সূরা ফুরকানে আল্লাহ তাআলা নিজের প্রিয় বান্দাদের কিছু পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। সেখানে বর্ণিত তাদের অন্যতম পরিচয়— তারা মহান প্রতিপালকের কাছে এ বলে দুআ করে-

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের এমন জীবনসঙ্গী ও সন্তানসন্ততি দান করুন, যাদের দেখে আমাদের চোখ জুড়াবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে 'ইমাম' বানিয়ে দিন। -সূরা ফুরকান (২৫) : ৭৪

স্ত্রী আর সন্তানসন্ততি- এ নিয়েই তো পরিবার। আল্লাহ তাআলার বিশেষ বান্দা যারা, তারা নিজেদের পরিবারের জন্য এভাবেই চোখের পানি ফেলে দুআ করে—আল্লাহ যেন তাদের পরিবারকে নেককার বানিয়ে দেন, চোখের শীতলতা বানিয়ে দেন, মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দেন। সন্দেহ নেই, দুআটির অর্থ ও মর্ম অনেক ব্যাপক। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার যে বন্ধন ও ভালবাসা, তা আল্লাহ তাআলার এক অসামান্য সৃষ্টি। কোনো প্রকার পূর্ব পরিচয় ছাড়াই, সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি ছেলে ও মেয়ে যখন বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একে অন্যকে জীবনসঙ্গী রূপে বরণ করে নেয়, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে সহসাই সৃষ্টি করে দেন এক আকর্ষণ ও ভালবাসা। আল্লাহ যদি নিজ কুদরতে এ আকর্ষণ সৃষ্টি করে না দিতেন, তবে একসঙ্গে থাকাই দুষ্কর হয়ে পড়ত। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা—

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً.

তাঁর অন্যতম নিদর্শন—তিনি তোমাদের থেকে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন। -সূরা রূম (৩০) : ২১

দিনে দিনে এ ভালবাসা গভীর হয়। সম্পূর্ণ স্বাধীন দুটি মানুষ একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে ধীরে ধীরে একটি যৌথ সত্তায় পরিণত হয়। এ ঘনিষ্ঠতা কতটা গভীর—পবিত্র কুরআনে মহান রাব্বুল আলামীন এর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এভাবে—

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ.

তারা তোমাদের পোশাক আর তোমরা তাদের পোশাক। -সূরা বাকারা (২) : ১৮৭

মানুষের জীবনে পোশাকের চেয়েও ঘনিষ্ঠ কিছু কি আছে! এ পোশাক আমাদের লজ্জা নিবারণ করে, পোশাক আমাদের আবৃত করে রাখে। পোশাক আমাদের ঘরে-বাইরে সর্বত্রই এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ। ধনী-গরিব, সাদা-কালো নির্বিশেষে সকলের গায়ের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে এ পোশাক। এমন জীবনঘনিষ্ঠ ও অনুপেক্ষ প্রয়োজনীয় বস্তুটির সঙ্গেই তুলনা করা হয়েছে স্বামী ও স্ত্রীকে। এরা একে অন্যের প্রতি গায়ের পোশাকের মতোই ঘনিষ্ঠ। পোশাক ছাড়া যেমন আমাদের জীবন কার্যত অচল, পারিবারিক এ আশ্রয় ছাড়াও আমাদের জীবন অনেকটাই প্রাণহীন। বিয়ের পর স্ত্রী যখন নিজের চেনা পরিবার-পরিবেশ ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন ঠিকানায় আশ্রয় নেয়, তখন স্বামীর চেহারায় তাকিয়ে থেকেই সে ভুলে যায় তার সকল বিরহযন্ত্রণা। আবার স্বামী যখন কাঁধে তুলে নেয় স্ত্রীর যাবতীয় দায়ভার, ধীরে ধীরে ভারি হতে থাকে সে দায়িত্বের বোঝা, এ বোঝা টানতে গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে স্বামী, রোদ-বৃষ্টি-ঝড় একাকার করে উপার্জনের নেশায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন স্ত্রীর কাছে ফিরে এসেই সে খুঁজে পায় প্রশান্তির ঠিকানা, ভুলে যায় সারাদিনের সব ক্লান্তিকর পরিশ্রমের কথা। এই তো আমাদের জীবন। পারিবারিক জীবনের এ আকর্ষণ, যেখানে স্ত্রীর সান্নিধ্যে স্বামী শান্তি পায়, এটাই মানুষের স্বাভাবিকতা। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে প্রথম মানব ও প্রথম নবী সায়্যিদুনা হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও তাঁর জীবনসঙ্গিনী হযরত হাওয়া রা.-এর সৃষ্টির আলোচনা করেছেন এভাবে—

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا.

তিনি তো সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে এক প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। -সূরা আ'রাফ (৭) : ১৮৯

রহস্য আল্লাহ তাআলা নিজেই উন্মোচন করে দিচ্ছেন এ বলে—স্ত্রীকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যেন স্বামী তার কাছে গিয়ে শান্তি পায়। রহস্যের এ বর্ণনা, স্বামী-স্ত্রীর

মধ্যকার হৃদ্যতা ও ভালবাসাকে আল্লাহ তাআলার অন্যতম নিদর্শন বলে উল্লেখ করা এবং নেককার মুমিনদের প্রার্থনা—চোখজুড়ানো জীবনসঙ্গী আমাদের দান করো—সবই এক সূত্রে গাঁথা।

জীবন চলার পথে এ সঙ্গী—স্বামী ও স্ত্রী যে এ কত বড় নিআমত, তা আমরা কিছুটা অনুমান করতে পারি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত জান্নাতের নিআমতরাজির বিবরণ থেকেও। জান্নাতের নিআমত সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা তো সেটাই, যা হাদীসে কুদসীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنَ رَأَتْ ، وَلاَ أُذُنَ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.

আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান যার কথা শোনেনি আর কোনো মানুষের হৃদয়ে যা কখনো কল্পনায়ও আসেনি। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৩২৪৪

এরপরও নিআমতরাজির কিছু বিবরণ কুরআন ও হাদীসের পাতায় বর্ণিত হয়েছে। এমনই একটি আয়াত—

وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا وَ لَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

যারা মুমিন ও সৎকর্মশীল, তুমি তাদের সুসংবাদ দাও, তাদের জন্যে রয়েছে এমন জান্নাতসমূহ, যার নিচ দিয়ে নদীসমূহ বয়ে যায়। যখনই সেখানে তাদেরকে সেখানকার ফলমূল খেতে দেওয়া হবে, তারা বলবে—এ তো সেটাই, ইতিপূর্বে যা আমাদেরকে খেতে দেওয়া হয়েছিল। তাদের কাছে সেসব সাদৃশ্যপূর্ণ অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। আর সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র সঙ্গিনীগণ। এবং তারা তাতে চিরকাল থাকবে। -সূরা বাকারা (২) : ২৫

বেহেশতের অফুরন্ত নিআমতরাজির মধ্যেও এক বিশেষ নিআমত- পুতঃপবিত্র স্ত্রী। সহজেই অনুমেয়, দুনিয়াতে এ নিআমত কত বড়!

একজন নেককার পুরুষের জন্য নেককার স্ত্রীর মতোই অসামান্য এক নিআমত—নেককার সন্তান। নিজের ঔরসজাত কিংবা গর্ভজাত বলে সন্তানের প্রতি ভালবাসা মানুষ পোষণ করে, বিষয়টি এখানেই শেষ নয়। সন্তান ছাড়া সংসারে পূর্ণতা আসে না। শুধু সাংসারিক পূর্ণতাই নয়, নিজের জীবনও যেন

অপূর্ণ থেকে যায়। অপূর্ণতার এ অনুভবে নারী-পুরুষে কোনো ফারাক নেই। নিঃসন্তান দম্পতি যারা, তারা আন্দায করতে পারবে— নিআমত হিসেবে সন্তান যে কতটা অসামান্য! পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এমনই এক নিঃসন্তান দম্পতির আকুতির বিবরণ দিয়েছেন। ঘটনাটি আমাদের নবী হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের। নিঃসন্তান অবস্থাতেই কেটে গিয়েছিল তাঁর যৌবনের দিনগুলো। তাঁর জীবনে এসে হানা দেয় বার্ধক্য। মাথার কালো চুলগুলো সাদা হয়ে যায়। বার্ধক্যের আঘাতে শরীর হয়ে পড়ে দুর্বল। বার্ধক্যে আক্রান্ত হয়েও সন্তানের আকাক্সক্ষা উপেক্ষা করতে পারেননি। আকুতিভরে আল্লাহ তাআলার দরবারে ফরিয়াদ করেছেন একজন সন্তানের জন্যে। পবিত্র কুরআনের বিবরণ পড়ুন-

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا، اِذْ نَادٰي رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا، قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَ اشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّ لَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآىِٕكَ رَبِّ شَقِيًّا، وَ اِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيْ وَ كَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا، يَّرِثُنِيْ وَ يَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ اسْمُهٗ يَحْيٰي لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا.

(এটি) স্বীয় বান্দা যাকারিয়ার প্রতি তোমার প্রতিপালকের রহমতের বিবরণ— যখন সে স্বীয় প্রতিপালককে মৃদুস্বরে ডাকল। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে গেছে, চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে; কিন্তু হে আমার প্রতিপালক! আপনার নিকট প্রার্থনা করে আমি কখনো বিফল হইনি। আমি আমার পরে আমার ভাই-বেরাদরের ব্যাপারে ভয় করি, অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। তবুও আপনি আমাকে আপনার পক্ষ থেকে একজন উত্তরাধিকারী দান করুন, যে আমারও উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়াকুবের বংশধরের উত্তরাধিকারও লাভ করবে। হে প্রতিপালক! তাকে এমন বানান, যে আপনার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হবে। (আল্লাহ বললেন,) হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার নাম হবে ইয়াহইয়া। আমি আগে এ নামে আর কাউকে সৃষ্টি করিনি। -সূরা মারইয়াম (১৯) : ২-৭

এই হল সন্তান। এ সন্তানের জন্য একজন নবী বার্ধক্যে উপনীত হয়েও আল্লাহর দরবারে দুআ করতে পারেন। তবে সবিশেষ লক্ষণীয়, হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম দুআ করেছেন এভাবে—আমাকে এমন এক সন্তান

দান করুন, যে হবে আপনার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত। সহজ ভাষায় আমরা বলতে পারি— নেককার। তাঁর এ প্রার্থনা সূরা আলে ইমরানে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً.

হে আমার প্রতিপালক! আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে এক নেককার সন্তান দান করুন। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ৩৮

শুরুতে সূরা ফুরকানে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার খাস বান্দাদের যে দুআর কথা বলা হয়েছে, সেখানে এমন নেককার সন্তান আর নেককার জীবনসঙ্গীই প্রার্থনা করা হয়। সন্তান ও জীবনসঙ্গী যদি নেককার না হয়, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত না হয়, তাহলে সুখের শত উপকরণে ডুবে থেকেও জীবন হয়ে পড়ে বিভীষিকাময়। কুরআনের ভাষায় যাকে বলা হয়েছে, 'ফিতনা'। সূরা তাগাবুনের আয়াত—

اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ.

নিশ্চয়ই তোমাদের ধনসম্পদ ও তোমাদের সন্তানসন্ততি ফিতনাস্বরূপ। -সূরা তাগাবুন (৬৪) : ১৫

ফিতনা মানে পরীক্ষা। সন্তান যদি নেককার হয়, তবে তো তা এক মহা নিআমত। তা এমন এক নিআমত, যার ফল মানুষ দুনিয়াতেও ভোগ করে, ভোগ করে মৃত্যু-পরবর্তী কবরের জীবনেও। মৃত মা-বাবার জন্য জীবিত সন্তানের যে আকুতিভরা দুআ—তা কি দুনিয়ার কোনো ভাষায় সংজ্ঞায়িত করা যায়! কিন্তু যদি -আল্লাহ না করুন- সে এমন না হয়, দুশ্চরিত্রের অধিকারী হয়, তবে যে সে সন্তান কেবল নিজের জীবন বরবাদ করবে, কিংবা বাবা-মা তার দুআ থেকে বঞ্চিত হবে— এমন নয়; বরং এ সন্তানের কারণে বাবা-মায়ের দ্বীনদারীও আক্রান্ত হতে পারে। তখন পরকাল বরবাদ হবে সকলের—সন্তানের এবং বাবা ও মায়ের; এমনকি দুনিয়ার স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনও জাহান্নাম হয়ে পড়তে পারে। মন্দ সন্তান বাবা-মাকেও মন্দ কাজে বাধ্য করতে পারে। অন্যায় মন্দ আবদার দিয়ে বাবা-মাকে তাদের অনুসৃত সরল পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারে। সন্তানের কাছে বাবা-মা এতটাই অসহায় হয়ে পড়েন, সারা জীবনের মেনে চলা রীতি-নীতিও তারা বিসর্জন দিতে বাধ্য হন ঐ দুশ্চরিত্র সন্তানের

কারণে। সূরা কাহফে আল্লাহ তাআলা নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও খাযির-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মূসা আ. হযরত খাজিরের সফরসঙ্গী হয়েছিলেন, কিছু সময়ের জন্য। পথিমধ্যে খাযির আ. অস্বাভাবিক ও অবোধগম্য কিছু কাজ করেছিলেন। মূসা আলাইহিস সালাম কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা আপত্তি নিয়ে সেসব সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। এর মধ্যে একটি ছিল—খাযির একটি ছোট বালককে হত্যা করেছিলেন। ঘটনা তো কুরআন কারীমে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীতে তিনি এ বালককে হত্যার কারণ হিসেবে বলেছেন, পবিত্র কুরআনের বর্ণনানুসারে—

وَ اَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَاۤ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا.

আর বালকটির বাবা-মা ছিল ঈমানদার। আমার আশঙ্কা হল, সে তাদেরকে অবাধ্যতা ও কুফরিতে লিপ্ত হতে বাধ্য করবে। -সূরা কাহফ (১৮) : ৮০

সন্তান যখন এমন হয়, তখনই সে ফিতনা বা পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে বুকের সন্তানের আবদার কিংবা দাবি, আরেকদিকে আল্লাহ তাআলার বিধান। এমন পরিস্থিতিতে যারা আক্রান্ত, তারাই এর জটিলতা অনুধাবন করতে পারবেন।

মোটকথা, পরিবার আমাদের জীবনে এক স্বাভাবিক বাস্তবতা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আপদে-বিপদে পরিবারের কাছেই আমরা আশ্রয় খুঁজে পাই। শত কষ্টের উপশম খুঁজে পাই। পরিবারের সদস্যরা—জীবনসঙ্গী কিংবা সঙ্গিনী এবং সন্তানাদি যদি দ্বীনদার হয়, নেককার হয়, তাহলে সে পরিবার আলোকিত পরিবার। দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী আবাসস্থলটাও এক টুকরা বেহেশত মনে হতে পারে। পার্থিব কোনো কষ্টই সেখানে মুখ্য নয়। কিন্তু যদি উল্টো হয়, তাহলে এর ফলও বিপরীতই হবে। এটাই স্বাভাবিকতা। পবিত্র কুরআনে তাই আমাদের এ চিরন্তন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে—আমরা যেন নিজেরাও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করি, আমাদের পরিবার-পরিজনকেও যেন বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করি। পড়ুন—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

হে ঈমানদারেরা! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত থাকবে কঠোরহৃদয় ফেরেশতারা, তারা আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করে না এবং তিনি তাদের যা আদেশ করেন, তারা তা-ই করে। -সূরা তাহরীম (৬৬) : ৬

আলোকিত পরিবার গড়ার জন্য এর বিকল্প নেই।

পরিবার গঠনে শরী'আতের ভিত্তি:

পরিবার গঠনে ইসলামী শরী'আতের রহস্য ও তাৎপর্য ততক্ষণ পর্যন্ত অনুধাবন করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবার গঠনে মানুষে স্বভাবসুলভ দিকগুলো সম্পর্কে এবং পরিবারের সকল সদস্যদের দায়িত্ব ও একে অপরের পরিপূরক ভূমিকা সম্পর্কে অনুধাবন করতে না পারবে। কারণ, মানুষ যখন এ সকল বিষয়ে অনুধাবন করতে পারবে তখন ইসলামী শরী'আতকে বুঝতে পারবে। আর যখন ইসলামী শরী'আতকে বুঝতে পারবে, তখন পরিবার গঠন সম্পর্কে ইসলামী শরী'আতের রহস্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে বুঝতে পারবে এবং পরিবারের সকল সদস্যদের দায়িত্ব বুঝাও তখন সহজ হবে।

অতএব, পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে পরিবারের সকল সদস্যের পরিপূরকমূলক দায়িত্বের প্রতি খেয়াল রেখেই দায়িত্ব অর্পণ ও পরিবার পরিচালনা করা। এটিই হচ্ছে মানুষের পারিবারিক সদস্যদের মাঝে আত্মিক ও জৈবিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি।

সাধারণত মানুষের মধ্যকার এ সম্পর্ক এবং বিশেষ করে পরিবারের সদস্যদের মাঝে এ ধরনের সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামী শরী'আতের দিক নির্দেশনাগুলো না বুঝার কারণে পরিবার গঠন ও পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে বুঝতে পারে না। যার কারণে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব ও সম্পর্কের বিষয়ে ভুল করে থাকে। তারা মনে করে যে, পরিবারের সকলের দায়িত্ব ও সম্পর্ক সমান। ফলে তারা মানুষের ফিৎরাত বা স্বভাবকে অনুধাবন করতে ভুল করে।

আর যখন স্বভাবকে অনুধাবন করতে ভুল করে, তখনই পরিবারের সদস্যদের মাঝে দায়িত্ব অর্পণে বিশৃঙ্খলা ও সীমালঙ্ঘন করে থাকে- যা শেষ পর্যন্ত পরিবারের মন্দ ডেকে নিয়ে আসে। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে মানুষের ফিৎরাত সম্পর্কে অনুধাবন না করা যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবার গঠনের ব্যাপারে ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করা সম্ভব হবে না।

আর পরিবারের সদস্যদের পরস্পর সম্মতি ও পরিপূরক ভূমিকা পরিবারের নারী-পুরুষ, বাবা-মা, ভাই-বোন, তথা সকল সদস্যের মাঝে ভালোবাসা, দয়া, অনুগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে। আর যখনই পরিবার থেকে সম্মতি ও পরিপূরক ভূমিকা, ভালোবাসা, দয়া অনুগ্রহ ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যায়, তখনই বাবার সম্পর্ক মায়ের সাথে এবং ছেলে-মেয়ের সম্পর্ক বাবার সাথে তথা পরিবারের প্রতিটি সদস্যের একে অপরের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। তখন সেই পরিবারের প্রতিটি সদস্য তার মানসিক, আর্থিক, জৈবিক, ও দৈহিক বিকাশে প্রয়োজনীয় তা'লীম-তরবিয়ত, সেবা-যত্ন, সহযোগিতা ও নিরাপত্তা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হয়। একটি শিশুর মানবিক আত্মিক, জৈবিক ও দৈহিক বিকাশ এবং একটি আদর্শ পরিবার গঠন তখনই সম্ভব, যখন পরিবারের সকল সদস্য তার সাধ্যানুযায়ী দায়িত্ব আদায় করে বা আদায় করতে চেষ্টা করে।

পুরুষের তুলনায় নারীর শারীরিক দুর্বলতা এবং সন্তানের সাথে নারীর বৈষয়িক ও আত্মিক আবেগ ও দয়াময় সম্পর্ক তাদের প্রতি দয়া অনুগ্রহ, সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রতি অনুপ্রাণিত করে। অপর দিকে নারীর তুলনায় পুরুষের জৈবিক দুর্বলতা এবং নারীত্বের কামনা- বাসনা ও তাদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ ও ভালোবাসার প্রতি অনুপ্রেরণা যোগায়। এ জন্যই আল্লাহ নারীর হাতে জৈবিক প্রশান্তির লাগাম তুলে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের এ জৈবিক ও বৌদ্ধিক প্রশান্তির ওপর পুরুষ সহজে প্রভাব ফেলতে পারে না, বরং নারী তার ইচ্ছায় জৈবিক ও বৌদ্ধিক প্রশান্তির ওপর অবিচল থাকতে পারে। সে তার এ অবিচলতা ততক্ষণ পর্যন্ত হারায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত পুরুষ তাকে দৈহিকভাবে স্পর্শ না করে বা দৈহিকভাবে স্পর্শ করার অনুমতি না দেয়। সুতরাং যখন একজন পুরষ নারীকে জৈবিক আবেগে স্পর্শ করে, তখন আর নারী তার জৈবিক ও বুদ্ধিক ভারসাম্য

রক্ষা করতে পারে না। অপর দিকে নারীর তুলনায় পুরুষের জৈবিক ও কাম-দুর্বলতার কারণে একজন নারীর দৃষ্টি বরং শুধুমাত্র কামনা-বাসনা ও চিন্তা-ধ্যান তাকে জৈবিক-ভাবে প্রভাবিত করে ফেলে। এমন কি অনেক সময় নারী তার বুদ্ধির মাধ্যমে একজন পুরুষকে তার প্রতি দুর্বল করে ফেলতে পারে। যার ফলে পুরুষ স্বাভাবিকভাবে নারী ও সন্তানদের প্রতি দুর্বল, নম্র ও দয়াপরবশ হয়ে পড়ে। এ সকল দিক বিবেচনায় নারী-পুরুষের অস্তিত্ব রক্ষা ও তাদের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামী শরী'আত নারী-পুরুষের মাঝে বিবাহের ব্যবস্থা করেছে। সেই বিবাহের মাধ্যমে বা বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষের বংশ মর্যাদা ও রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছে। এ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিশুর মানবিক, দৈহিক ও আত্মিক বিকাশ ঘটে এবং নারী ও সন্তানদের ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। এ জন্যই আল্লাহ পুরুষদেরকে নারী ও সন্তানদের দায়িত্ব ভার গ্রহণ ও বহন করার ক্ষমতা দান করেছেন। এ সবকিছুর মধ্য দিয়ে নারী পুরুষের মধ্যে প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, গড়ে উঠে পরিবার। সেই পরিবারই হয় সন্তানের শান্তি, নিরাপত্তা ও আশ্রয়স্থল। নিশ্চয় পুরুষকে নারীত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য তাকে নারীর তুলনায় সাহসিক ও শক্তিশালী হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে তারা পারিবারিক প্রয়োজনে নারী ও সন্তানদের প্রয়োজন পূরণ এবং তাদের লালন পালন ও পরিচালনা করতে পারে। নারীদেরকে পুরুষের তুলনায় দুর্বল, নম্র, কোমল ও আবেগময়ী করে সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে পরনির্ভরশীল দুর্বল শিশু ও আবেগময়ী পুরুষ তাদের কাছে শান্তি ও আশ্রয় নিতে পারে।

এ জন্যই পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আর নারীদেরকে তাদের শক্তি সামর্থ্য ও ইচ্ছানুযায়ী পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে কাজ-কর্ম করার নির্দেশ প্রদান করেছে। তার চেয়ে বেশি কিছু তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া বা বাধ্য করা, তাঁদের প্রতি যুলুম ও দুর্ব্যবহারের নামান্তর, যা শরী'আত, মানুষের স্বভাব এবং নারী পুরুষের একে অন্যের পরিপূরক নীতির পরিপন্থী।

মুসলমানের পরিবার কেমন হবে:

কাফির-মুশরিকদের ধর্মীয় প্রতীক, তাদের উপাস্য, দেব-দেবীসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চিহ্ন ঘর থেকে অপসারণ করুন:

আয়িশা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ

'ঘরে যেই জিনিসের মধ্যেই কোনো ক্রুশের চিহ্নসদৃশ আলামত থাকত, নবিজি তা ভেঙে ফেলতেন। ২২

এই জমানায় আমরা অনেক বড় একটি পরীক্ষার মধ্যে রয়েছি। বর্তমানে কাফির-মুশরিকদের দেশ থেকে তাদের তৈরিকৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র আমাদের দেশে আমদানি হয়। যেগুলোতে তাদের উপাস্য বা ধর্মীয় প্রতীকের ছবি অঙ্কিত থাকে। বিভিন্ন আকৃতিতে ক্রুশ চিহ্ন, যিশু, মেরির কাল্পনিক ছবি; অনুরূপভাবে গির্জার ছবি, দেব-দেবীর মূর্তি, গৌতম বুদ্ধের মূর্তি; আবার গ্রিকদের উপাস্যকে প্রেম-ভালোবাসার দেবতার প্রতিমা বলে আমদানি করা হয়। এভাবে কল্যাণ-অকল্যাণের দেবতার প্রতিমা থেকে শুরু করে নানান ধরনের শিরকি ছবি, মূর্তি, প্রতিমা আমাদের ঘরে প্রবেশ করে।

কোনো তাওহিদবাদী মুসলিমের ঘরে কোনোভাবেই শিরকের প্রতীক থাকতে পারে না। বরং একজন মুসলিম তো শিরককে তার মূলসহ উপড়ে ফেলবে। আর এ কারণেই তো রাসুলুল্লাহ নিজ ঘরে যখন কোনো ক্রুশের চিহ্ন দেখতেন, সাথে সাথে তিনি তা ভেঙে ফেলতেন।

এখানে ভাঙা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সেগুলো অপসারণ করা। যদি অঙ্কিত ছবি হয়, তাহলে মুছে ফেলে তা অপসারণ করতে হবে। আর যদি নকশিকৃত থাকে, তবে নকশাটা তুলে ফেলতে হবে। আর যদি কোনো স্টিকারের মাধ্যমে হয়, তাহলে

স্টিকার উঠিয়ে ফেলার মাধ্যমে সমাধান হয়ে যাবে। আর যদি খোদাই করার মাধ্যমে হয়, তাহলে ঘষে বা অন্য কোনোভাবে তার চিহ্ন মুছে ফেললেই হবে। মোট কথা যেভাবেই চিহ্নটা দূর করা যাবে, সেভাবে করে একে মূলোৎপাটিত করতে হবে এবং পুরোপুরি দূর করতে হবে।

এখন কেউ কেউ এটাকে বাড়াবাড়ি বলতে পারে। কিন্তু এটা দ্বীনের ক্ষেত্রে غلو বা বাড়াবাড়ি নয়। কারণ যিনি আমাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন, খোদ তিনিই (এ) আমাদের এটি করে দেখিয়েছেন, তাঁর থেকেই আমরা এ আদর্শ পেয়েছি। তিনি আমাদের নির্দেশনা দিয়ে গেছেন, কোথায় কী করতে হবে, কোথায় কোন কর্ম যথার্থ হবে।

এ কারণে সকলের উচিত যখন ঘরের জন্য পাত্র, চাদর, পর্দা বা অন্য কোনো আসবাবপত্র কিনবে, তখন ভালোভাবে খেয়াল করে কিনবে যে, তার মধ্যে তাওহিদবিরোধী বিধর্মীদের কোনো প্রতীক আছে কি না? যদি থেকে থাকে, তাহলে সেগুলো পরিহার করে চলবে। এ ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা হলো, তার মধ্যে যদি শিরকের চিহ্ন বা কোনো আলামত না থাকে, তাহলে এতে থাকা নকশা মিটানো ওয়াজিব নয়।

অনেক মানুষই তাদের ঘর সাজাতে দেয়ালে বিভিন্ন ছবি ও চিত্র ঝুলায়। ঘরের কোণে তাকের ওপর বিভিন্ন পশুপাখি, এমনকি মানুষের মূর্তি বসায়। ঝুলানো চিত্রগুলোর কোনোটি আছে জড় বস্তু, আবার কোনোটি জীব; জীব, যেমন: মানুষ ও পশুপাখি ইত্যাদি।

এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের কথা স্পষ্ট যে, প্রাণীর স্থির চিত্র হারাম; চাই সেটা খোদাই করা হোক বা আঁকা কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে হোক। যেখানে ছবি স্থির থাকে না, তা যেমন: আয়না বা পানির ওপরের ক্ষণিকের ভাসমান ছবি। হাদিসে ছবি অঙ্কনকারীদের লানত করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন তাদের এ অসাধ্য কাজ সাধন করতে বলা হবে। তাদের অঙ্কিত ছবির মধ্যে রুহ

ফুঁকতে বলা হবে। যারা ছবি অঙ্কন করবে, তাদের সকলের জন্যই এমন বিপদঘন মুহূর্তটি অবধারিত। তবে যা একান্ত প্রয়োজনের কারণে করা হয় তার হুকুম ভিন্ন। যেমন, কারও ব্যক্তিগত পরিচয় শনাক্ত করার ক্ষেত্রে, কোনো অপরাধীকে ধরার জন্য তার স্থির চিত্র করা হারাম নয়।

দেয়ালে প্রাণীর ছবি ঝুলানো তো হারামই, দ্বিতীয়ত এ ছবি ঝুলানোর মধ্যে আরও একটি গুনাহ রয়েছে-এই ছবির মাধ্যমে ছবিওয়ালাকে এক ধরনের সম্মান করা হয়। এবং কখনো কখনো এটা মানুষকে শিরকে পতিত করে ছাড়ে। যেমনটি হয়েছিল নুহ এর সম্প্রদায়ের। ছবি টানানোর সর্বনিম্ন ক্ষতি হলো, এটি মানুষের মধ্যে দুঃখ-বেদনা জাগিয়ে তোলে। অথবা তার বাপ-দাদার কৃতকর্মে অন্তরে গর্ব-অহংকার সৃষ্টি করে। এমন লোকেরা যেন না বলে যে, ছবি রাখলে ক্ষতি কী? আমরা তো আর ছবিকে সিজদা করছি না। তাদের উদ্দেশে বলছি, যারা নিজেদের ঘরকে ফেরেশতাদের প্রবেশের বরকত থেকে বঞ্চিত করতে চায়, তারা তাদের ঘরে ছবি ঝুলাতে পারে। রাসুলুল্লাহ বলেছেন:

إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ صُوَرٌ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ

'যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে, তাতে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না।'

প্রাণীর ছবি নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে, এখানে কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করা হলো:

রাসুলুল্লাহ বলেন:

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُون

'কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি শাস্তির সম্মুখীন হবে চিত্রশিল্পীরা। '২৪

আব্দুল্লাহ বিন উমর থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

'যারা এ সকল ছবি তৈরি করে, কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দেওয়া হবে, তাদের বলা হবে "তোমরা যা সৃষ্টি করেছিলে, তা জীবিত করো। "'২৫

আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন, তিনি একবার মদিনার এক বাড়িতে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, বাড়ির ওপরের দিকে (দেয়ালে) এক চিত্রশিল্পী চিত্র আঁকছে। তিনি বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন:

يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً

'আল্লাহ তাআলা বলেন, "সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক জালিম আর কে আছে, যে আমার মতো সৃষ্টি করতে যায়। সুতরাং তারা যেন একটি দানা সৃষ্টি করে দেখায় এবং তারা যেন একটি ক্ষুদ্র কণা তৈরি করে দেখায়।"'২৬

আবু জুহাইফা বর্ণনা করেন:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ المُصَوِّر' َ
নবিজি ছবি অঙ্কনকারীদের লানত করেছেন। '২৭

বিষয়টি যেন আপনার নিকট আরও স্পষ্ট হয়, সে জন্য এ ব্যাপারে আহলে ইলমদের কিছু মতামত তুলে ধরছি:

إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ صُوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَة[ُ
যে ঘরে ছবি থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। হাদিসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার আসকালানি বলেন:

'এখানে ঘর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন সকল স্থান, যেখানে মানুষ অবস্থান করে; সেটা বাড়িও হতে পারে আবার তাঁবু বা অন্য কিছু যেখানে মানুষ বাস করে। '২৮

যে সকল ছবি ফেরেশতাদের প্রবেশে বাধা দেয়, তা হলো এমন প্রাণীর ছবি, যার মাথা কাটা হয়নি (অর্থাৎ মাথাসহ ছবি) অথবা যাকে তুচ্ছজ্ঞান করা হয়নি।২৯ (তুচ্ছজ্ঞানের অর্থ হলো, তাকে পা দিয়ে মাড়ানো এবং লাথি দেওয়া।)

কোনো প্রাণীর ছবি বানানোর কাজটি এমন বিদাআতপূর্ণ কাজ, যা ছবি-পূজারিরা শুরু করেছে। যা নুহ এর কওমের লোকদের কর্ম থেকে বুঝা যায়। হাবশায় অবস্থিত গির্জা এবং তাতে যে ছবি ছিল, তা নিয়ে আয়িশা(রা:) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ বলেছেন:

كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةِ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ

'তাদের মধ্যে যখন কোনো সৎ লোক মৃত্যুবরণ করত, তারা তার কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করত এবং তাতে তার ছবি তৈরি করত। আল্লাহ তাআলার নিকট তারাই হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি।'৩০

ইবনে হাজার এর সাথে আরও একটু যুক্ত করে বলেন:

'নবী(সা:) বলেন, প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা জঘন্য হারাম। এটা কবিরা গুনাহ। কারণ এ ব্যাপারে কঠিন শাস্তির ধমক এসেছে। ছবিটা সে নিজের জন্য আঁকুক বা অন্যের জন্য, সর্বাবস্থায় এটা হারাম। জামা-কাপড়, পর্দা-চাদর, টাকা-পয়সা, ঘরের দেওয়াল, ঘরের আসবাবপত্র ইত্যাদি কোনো স্থানেই প্রাণীর ছবি আঁকা জায়িজ নেই। তবে প্রাণীর ছবি ব্যতীত অন্য ছবি আঁকা জায়িজ; হারাম নয়।

আমি বলব, হাদিসের ব্যাপকতা এমন প্রতিটি অবয়বকেই শামিল করে যার ছায়া রয়েছে বা যার ছায়া নেই। মুসনাদে আহমাদে এসেছে, আলি থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ বলেন:

أَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَا يَدَعُ بِهَا وَثَنًا إِلَّا كَسَرَهُ، وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّخَهَا

"তোমাদের যে-ই মদিনায় পৌঁছবে, সে যত মূর্তি পাবে সব ভেঙে ফেলবে এবং যত ছবি পাবে সব মুছে ফেলবে। ৩১

রাসুলুল্লাহ সর্বদা নিজ ঘরকে নিষিদ্ধ ছবি থেকে পবিত্র রাখতে চেয়েছেন। এখানে তার একটা উদাহরণ উল্লেখ করছি, এটি সহিহ বুখারিতে من لم يَدْخُلْ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ)ঘরে ছবি থাকায় যিনি প্রবেশ করেননি) শিরোনামের অধ্যায়ে এসেছে, আয়িশা থেকে বর্ণিত:

'তিনি একটি বালিশ কিনলেন, যাতে অনেক ছবি ছিল। রাসুলুল্লাহ যখন তা দেখলেন, তখন ঘরে প্রবেশ না করে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। আয়িশা তখন তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ দেখে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের দিকেই প্রত্যাবর্তন করব। আমি কী অপরাধ করেছি?" তিনি বললেন, "এই বালিশের ব্যাপারটি কী?" আয়িশা বললেন, "আমি এটা কিনেছি যেন আপনি এতে হেলান দিতে পারেন এবং এতে মাথা রাখতে পারেন।" তখন রাসুলুল্লাহ বললেন:

إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، وقال : إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ صُوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ

"নিশ্চয় এই ছবি অঙ্কনকারীদের কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যা সৃষ্টি করেছ, তা জীবিত করো।" এবং তিনি বলেন, "নিশ্চয় যে ঘরে ছবি থাকে, তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। "৩২

কেউ কেউ এই প্রশ্ন করতে পারে যে, এই বিষয়টি নিয়ে এত দীর্ঘ আলোচনার কী প্রয়োজন? আমরা তাদের বলব, আমরা অনেক ঘরে প্রবেশ করে দেখতে পাই, সেখানে দেয়ালে, ছাদের সাথে, তাকের ওপর ও টেবিলের ওপর বিভিন্ন গায়ক-গায়িকার উলঙ্গ, অর্ধ উলঙ্গ ছবি ঝুলানো থাকে। ঘরের মালিক সকাল-সন্ধ্যা তা দেখে। কেউ কেউ আবার তাতে চুমু খায় এবং বিভিন্ন খারাপ চিন্তা করে। ফলে এই ছবিগুলোই অনেক ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হওয়ার বড় কারণ হয়। এবং এর মাধ্যমে

জ্ঞানীদের নিকট প্রাণীর ছবি শরিয়তে হারাম হওয়ার হিকমতও প্রকাশ পাবে, ইন শা আল্লাহ।

আমরা এই অনুচ্ছেদটি শেষ করার আগে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই:

১. কেউ কেউ বলেন, বর্তমান সময়ে তো ছবি রীতিমতো আমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত আছে।

আমরা বলব, আপনারা সম্ভব হলে ছবিহীন জিনিস কেনার চেষ্টা করুন। আর বাকিগুলোর ওপরের অংশের কাভারের ছবিগুলো মুছে ফেলুন বা উঠিয়ে ফেলুন। যেমন বইয়ের ওপরের পৃষ্ঠার ছবি মুছে ফেলুন এরপর বই থেকে উপকার অর্জন করুন। আর যেগুলো ব্যবহার করা শেষ, তা বাড়ির বাইরে বের করে দিন। যেমন পত্রিকা পড়া শেষ হলে ঘর থেকে বের করে অন্যত্র রাখুন। আর যেগুলো ওঠানো সম্ভব নয়, যেমন খাবারের প্যাকেটের ওপরের ছবি, এগুলো থাকলে কোনো সমস্যা হবে না, ইন শা আল্লাহ। উলামায়ে কিরামের মতামত এমনটিই। এটি আমাদের ওপর উমুমে বালওয়া তথা ব্যাপক আকারে ছড়ানো বিপদের আকার ধারণ করেছে। কোনো বিষয় অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়লে সেখানে কিছুটা ছাড় থাকে। এবং তা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে হয়।

২. যদি দেয়ালের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তাতে ছবি ঝুলানোর খুব বেশি প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে কোনো প্রাণহীন প্রকৃতির ছবি ঝুলাতে হবে অথবা কোনো মসজিদের ছবি বা শরয়িভাবে নিষিদ্ধ নয়, এমন ছবি ঝুলাতে হবে।

৩. যারা ঘরের দেয়ালে কুরআনের আয়াত ঝুলায়, তাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, কুরআন ঘরে টানিয়ে রাখার জন্য নাজিল হয়নি। এ ছাড়া কোনো সিজদারত মানুষ, পাখি অথবা এ ধরনের অন্য কিছুর আকারে কুরআনের আয়াত অঙ্কন করে টানিয়ে রাখা কুরআনে আয়াতের সাথে বেয়াদবির শামিল। এবং যারা কুরআনের আয়াত টানিয়ে রাখেন, তাদের ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, তার

ওপর যে আয়াত টানানো আছে, এর খেলাফ কোনো কিছু যেন তার থেকে প্রকাশ না পায়।

ধূমপান বর্জন করুন:

ধূমপান হারাম হওয়ার জন্য এই আয়াতই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

'আর তিনি তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ।১০০

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খাদ্য ও পানীয়কে দুভাগে ভাগ করেছেন:

১. পবিত্র হালাল খাবার।

২. অপবিত্র হারাম খাবার।

এখানে তৃতীয় আর কোনো প্রকার নেই। এখন কার এই সাহস আছে যে, দুর্গন্ধ নির্গমন, সম্পদের অপচয় এবং শারীরিক ও আত্মিক ক্ষতিতে ভরপুর এ ধূমপানকে উত্তম ও পবিত্র বলবে?

কোনো ভদ্র ও ভালো পরিবারে সিগারেট জ্বালানোর লাইটার ও ছাইদানিও থাকে না, হুঁকো বা এ জাতীয় অন্য কিছু থাকবে তো দূরের কথা।

আপনার পরিবারের কেউ ধূমপান করবে তো দূরের কথা আপনার বাড়িতে আগমণকারীদের মধ্যেও যেন কেউ ধূমপান করতে না পারে, সে জন্য 'ধূমপান নিষেধ' লিখে বাড়ির সামনে ঝুলিয়ে দেবেন। আর যদি কাউকে আপনার সামনে

এ হারামে লিপ্ত হতে দেখেন, তাহলে উপযুক্ত মাধ্যম গ্রহণ করে তাকে নিষেধ করে দেবেন।

৩৩. সুরা আল-আরাফ: ১৫৭

ঘরে কুকুর রাখা থেকে বিরত থাকুন:

আমাদের অনেকেই কাফির-মুশরিকদের অনুকরণ করতে করতে এতটাই নিচে নেমে গেছে যে, ওরা এখন যা করে, এরাও তাদের অনুসরণ করে তাই করে। কাফিররা ঘরে কুকুর পালে তো এরাও এখন ঘরে কুকুর পালা শুরু করেছে। এবং এর পেছনে বিশাল অঙ্কের টাকা খরচ করছে।অথচ মুসনাদে আহমাদের এক হাদিসে এসেছে 'কুকুরের মূল্য হারাম'। তারা কুকুরের খাবার ও তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পেছনে অনেক টাকা ঢালছে। এ সম্পর্কে অবশ্যই তাদের কিয়ামতের দিন হিসেব দিতে হবে।

এখন তো কুকুর পালন অনেক ধনী ও উচ্চপদস্থ চাকরিজীবীদের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। এমনকি বড় বড় কর্মচারী ও ধনী ব্যক্তিদের ধনাঢ্যতার চিহ্ন হচ্ছে-তাদের ঘরে কুকুর থাকবে। কুকুর তাদের শরীরে এমনকি কারও কারও মুখে জিহ্বা লাগায়। তাদের বিভিন্ন পাত্রে মুখ লাগায়। অথচ কুকুরের লালা নাপাক, কুকুর যদি কোনো পাত্রে মুখ দেয়, তবে সেটা ধোয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। একবার মাটি দিয়ে ঘষাসহ সাতবার ধোয়ার আগে তা পবিত্র হয় না।

যারা কুকুর পালন করে তাদের দৈনিক কত নেকি নষ্ট হয়, তার কোনো হিসেব আছে? হাদিস শরিফে এসেছে, রাসুলুল্লাহ বলেছেন:

مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ

'যারা কুকুর পালন করে প্রতিদিন তাদের এক কিরাত নেকি নষ্ট হয়। (আর মুসলিম শরিফের বর্ণনায় এসেছে দুই কিরাত করে নেকি নষ্ট হয়।) তবে শিকারি কুকুর, ফসল ও বকরি পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুর রাখা যাবে।

৩৪. মুসনাদু আহমাদ: ১/৩৫৬, সহিহুল জামি': ৩০৭১

৩৫. কিরাত হলো ওজন পরিমাপের একটি একক।

৩৬. সুনানুত তিরমিজি: ১৪৮৯, সহিহ আল-জামি': ৫৩২১

কিন্তু যারা শখ করে ঘরে কুকুর রাখে, প্রতিদিন তাদের কত নেকি নষ্ট হয়, একটু চিন্তা করে দেখুন।

শিকারি, পাহারাদারি, খেত ও পশুর জন্য কুকুর রাখাটা কুকুর পালনের নিষেধাজ্ঞার বাইরে। এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে অপরাধী ধরা, মাদকদ্রব্য উদ্ধারসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা কাজে ব্যবহৃত কুকুর। অর্থাৎ প্রয়োজনে এগুলো লালন পালন করা জায়িজ। এ বিষয়ে এটাই আহলে ইলমদের মূল বক্তব্য।৩৭

এই তো আমরা হাদিসে দেখতে পাই যে, ঘরে কুকুর থাকার কারণে জিবরিল রাসুলুল্লাহ এর সাথে পূর্ব নির্ধারিত সাক্ষাৎ করতে আসেননি। রাসুলুল্লাহ বলেছেন:

'আমার নিকট জিবরিল আসলো এবং আমাকে বলল, "আমি রাতে আপনার কাছে এসেছিলাম কিন্তু আপনার ঘরে একটি মানুষের প্রতিকৃতি ছিল। একটি পর্দার কাপড়ে ছিল অনেক ছবি। ঘরে একটি কুকুর ছিল, তাই আমি প্রবেশ করিনি। সুতরাং আপনি মানুষের প্রতিকৃতির মাথা কেটে ফেলতে বলুন, যাতে তা কোনো একটি গাছের আকৃতিতে থাকে, পর্দাটা কেটে ফেলতে বলুন, যাতে তা দিয়ে হেলান দেওয়ার দুটি বলিশ বানানো যায়। কুকুরকে ঘর থেকে বের করে দিতে বলন।" তখন রাসুলুল্লাহ তা-ই করলেন। '

বর্তমানে আমরা আমলে কতটা দুর্বল, তা তো আমরা নিজেরাই জানি। প্রত্যেকে অবগত আছি নিজ নিজ অবস্থা সম্পর্কে। যদি আমলের ঘাটতি সম্পর্কে আমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, তবে সালাফে সালিহিনের সাথে আমাদের তুলনা করে দেখি। আমরা আর আমাদের আমল কতই না নগণ্য ও সামান্য! কিন্তু আমরা যদি ঘরে কুকুর রেখে সে আমলকে প্রতিদিন ব্যাপক আকারে কমাতে থাকি, তবে আমাদের আর সম্বল হিসেবে কীই-বা থাকবে!?

৩৭. দেখুন, আহমাদ শাকির কৃত তিরমিজির টীকা: ৩/২৬৭।

৩৮. আবু হুরাইরা এ থেকে বর্ণিত, সহিহুল জামি': ৬৮

বাড়ি-ঘরে কারুকার্য করা থেকে বিরত থাকুন:

বর্তমানে অনেক মানুষই তাদের বাড়িঘরে বিভিন্ন ডিজাইনের কারুকার্য করে থাকে। তা দৃষ্টিনন্দন করে হরেক কালারের বাতি দিয়ে। এটা দুনিয়ার সাথে গভীর সম্পর্ক, দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকা ও পার্থিব জীবন নিয়ে গর্ব-অহংকার করার ফলাফল ছাড়া আর কিছুই নয়।

কোনো কোনো ঘরে প্রবেশ করলে আপনার মনে পড়ে যাবে ইবনে আব্বাস এর এই বাণীটি, 'শুধু নাম ব্যতীত জান্নাতের কিছু দুনিয়াতে নেই।' বর্তমানে যে সকল উপকরণে বাড়ি-ঘর কারুকার্য ও সাজসজ্জা করা হয়, তা এই সংক্ষিপ্ত বইয়ে বর্ণনা করাও সম্ভব নয়। তবে আমরা এখানে আল্লাহ তাআলার এই বাণী স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ(◌َ

'যদি সব মানুষের এক মতাবলম্বী (কাফির) হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তবে যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে, আমি তাদের ঘরের ছাদও করে দিতাম রুপার এবং তারা যে সিঁড়ি দিয়ে চড়ে তাও। আর তাদের ঘরের দরজাগুলো এবং সেই পালংগুলোও, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসে। বরং স্বর্ণনির্মিতও দিতাম। এগুলো সবই তো পার্থিব জীবনের ভোগসামগ্রী মাত্র। আর পরকাল আপনার পালনকর্তার কাছে তাঁদের জন্যই, যারা ভয় করে। '৩৯

৩৯. সুরা আজ-জুখরুফ: ৩৩-৩৫

'অর্থাৎ যদি বেশির ভাগ জাহিলদের পক্ষ থেকে এই ধারণা বা বিশ্বাসের ভয় না থাকত যে, আমি যাদের সম্পদ দিই, তাদের এই কারণেই দিই যে, আমি তাদের ভালোবাসি। তবে এটা ভেবে সকলে সম্পদের জন্য কাফির হয়ে যেত।' তাহলে আমি কাফিরদের বাড়ি, ছাদ, সিঁড়ি, এমনকি তাদের দরজার তালা পর্যন্ত দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের সামগ্রী সোনা-রুপা দিয়ে বানিয়ে দিতাম। যাতে তাদের সকল ভালো কাজের বিনিময়ে দুনিয়াতেই তারা পরিপূর্ণ অংশ নিয়ে নেয়। তাদের কাছে তো কোনো পুণ্য ও পুরস্কার থাকবে না। কেননা, তারা তো দুনিয়াতেই সব পেয়ে গেছে।

সহিহ মুসলিমে এসেছে। আয়িশা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ فِي غَزَاةٍ، فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ، فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ، وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ

'রাসুলুল্লাহ এক যুদ্ধে বের হলেন, তখন আমি একটি ঝালরবিশিষ্ট পর্দা নিয়ে দরজার ওপর টানিয়ে দিলাম। তিনি যখন ফিরে এলেন এবং পর্দাটি দেখতে পেলেন, তখন আমি তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ দেখলাম। অতঃপর তিনি পর্দাটি ধরে টেনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। এবং বললেন "আল্লাহ তাআলা আমাদের এই আদেশ দেননি যে, আমরা পাথর ও মাটি পরিধান করব। "'৪১

মুসনাদে আহমাদে ফাতিমা খাবার রান্না করে ফাতিমা এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একবার আলি কে বললেন রাসুলুল্লাহ কে দাওয়াত দিতে। রাসুলুল্লাহ এসে দরজার পাল্লার ওপর তাঁর হাত রাখলেন। কিন্তু কারুকার্যমণ্ডিত একটি কাপড় দেখতে পেয়ে ফিরে গেলেন।

৪০. ইবনু কাসির: ৭/২১৩

৪১. সহিহু মুসলিম: ৩/১৬৬৬

তখন ফাতিমা আলি কে বললেন, 'যান, তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কেন ফিরে গেলেন?' আলি এর জিজ্ঞাসার জবাবে রাসুলুল্লাহ বললেন, 'আমার জন্য কারুকার্যমণ্ডিত সুসজ্জিত ঘরে প্রবেশ করা উচিত নয়।'৪৩

সুনানে আবু দাউদে এ হাদিসটি এসেছে 'দাওয়াতকৃত মেহমান যখন মেজবানের ঘরে শরিয়তের অপছন্দনীয় কিছু দেখতে পায়' নামক অধ্যায়ে।৪৪

সহিহ বুখারির 'দাওয়াতের মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু দেখলে কি ফিরে আসবে?' নামক অধ্যায়ের তা'লিকে বর্ণিত হয়েছে:

وَدَعَا ابْنُ عُمَرَ أَبَا أَيُّوبَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ سِتْرًا عَلَى الْجِدَارِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ غَلَبَنَا عَلَيْهِ النِّسَاءُ فَقَالَ مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ وَاللَّهِ لاَ أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا فَرَجَعَ

'ইবনে উমর আবু আইয়ুব কে দাওয়াত দিলেন। তিনি এসে (ইবনে উমর এর ঘরের) দেয়ালের ওপর কারুকার্য করা পর্দা দেখতে পেলেন। তখন ইবনে উমর বলেন, "এ ব্যাপারে মহিলারা আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে।"

এ শুনে আবু আইয়ুব বললেন, "কিছু মানুষের ব্যাপারে আমি আশঙ্কা করেছিলাম। কিন্তু আপনার ব্যাপারে এমন কোনো আশঙ্কা করিনি। আল্লাহর শপথ, আমি আপনাদের ঘরের খাবার খাব না।""৪৫

মুসনাদে আহমাদে সালিম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আমার পিতা বেঁচে থাকা অবস্থায় বিবাহ করেছি। তখন আমার বাবা লোকদের দাওয়াত দিলেন। দাওয়াতি মেহমানদের মধ্যে আবু আইয়ুব ও একজন ছিলেন। বাড়ির লোকেরা আমার ঘরে সবুজ

৪২. অন্য রিওয়ায়াতে এসেছে নবির জন্য।

৪৩. মুসনাদু আহমাদ: ৫/২২১, সহিহুল জামি': ২৪১১

৪৪. সুনানু আবি দাউদ: ৩৮৫৫

৪৫. ফাতহুল বারি: ৯/২৪৯

নকশি একটি পর্দা ঝুলিয়েছিল। আবু আইয়ুব এসে ঘরে দৃষ্টি দিয়ে এটি দেখতে পেলেন এবং বললেন, "আব্দুল্লাহ, তোমরাও দেয়ালে এমন পর্দা টানাও!" তখন আমার বাবা লজ্জিত হয়ে বললেন, "হে আবু আইয়ুব, এ ব্যাপারে মহিলারা আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে।" এরপর আবু আইয়ুব বলেন, "যাদের ব্যাপারে আমি আশঙ্কা করতাম যে, তাদের ওপর মহিলারা প্রভাব বিস্তার করবে... (আপনাকে আমি তাদের মধ্যে মনে করতাম না)। ""৪৬

তাবারানির বর্ণনায় এসেছে, আবু জুহাইফা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ বলেছেন:

سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا حَتَّى تُنَجِّدُوا بُيُوتَكُمْ كَمَا تُنَجَّدُ الْكَعْبَةُ

'তোমাদের ওপর দুনিয়াকে খুলে দেওয়া হবে, তখন তোমরা তোমাদের ঘরকে এমনভাবে সুসজ্জিত করবে, যেমনিভাবে কাবাকে সুসজ্জিত করা হয়।'৪৭

ঘর-বাড়ি কারুকার্য করার ক্ষেত্রে উলামায়ে কিরামের কথার খোলাসা হলো: তা হয়তো মাকরুহ, নয়তো হারাম। ৪৮

وَاللَّهُ أَعْلَمُ؛ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

আদর্শ দ্বীনি পরিবার :

দ্বীনি স্ত্রীর দায়িত্ব :

যুগ ও যামানা যেমনই হোক। কল্যাণ ও সফলতা আপনার চাই-ই চাই। নিজের ক্ষতি নিজে কীভাবে মেনে নিবেন? অকল্যাণের পথে কেনইবা হাঁটবেন? দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবী তো আপনার জীবনের লক্ষ্য। আর সেই কামিয়াবী নিহিত রয়েছে দ্বীনের মাঝে। অতএব দ্বীন থেকে আপনি পিছপা হবেন না। বাহ্যিক আড়ম্বরতা দেখে ধোঁকা খেয়ো না। তুমি পর্দার সৌন্দর্য ধারণ কর। লজ্জাশীলতার কল্যাণ আঁকড়ে ধর। সকল ক্ষেত্রে এবং সবার ক্ষেত্রে তুমি তোমার দ্বীনী গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে চলো।

এজন্য খুব সহজ ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় বলি।

বুঝের বয়স থেকেই আত্মীয় ভাইদের সামনেও এমনভাবে আসা উচিত, যেন বুঝা যায় পর্দা করছি। কখনো তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা না বলা। নিজের হাতে তৈরি কোনো জিনিস তাদেরকে না দেখানো। তাদের সাথে হাসি ঠাট্টা না করা। তারা আগ বেড়ে কিছু বললে উত্তর দিতে যাবে না। বরং তুমি যে এটা অপছন্দ করছ এমন ভাব প্রকাশ করবে। এতে বাহ্যিক দূরত্বটা স্পষ্ট হবে।

খেয়াল রাখবে যেন কেউ তোমার নাম ধরে উচ্চস্বরে না ডাকে। এতে বাইরের লোকেরা খুব সহজেই এবং সবার অজ্ঞাতসারেই তোমার নাম জেনে যাবে। কাউকে ডেকে এনে ঘরে বসাবে না। তার কণ্ঠ শুনতে যাবে না। এভাবে প্রতিটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করবে।

কাপড় চোপড় ও সাজসজ্জা এমনভাবে করবে যেন তোমাকে পরিপাটি দেখা যায়। বুড়ি হয়ে থাকবে না। নিজেকে অগোছালো করে রাখবে না। চোখে চোখ রেখে কথা বলার অভ্যাস না করা। কারো কথার মাঝে কথা বলতে শুরু করবে না।কিছু বৈশিষ্ট্য সব স্ত্রীদের থাকা উচিত :

১. লজ্জাশীলতা
২.ছোটদের প্রতি স্নেহপূর্ণ আচরণ
৩.ভাই-ভাবীদের সাথে ভালো আচরণ
৪.শ্বশুরবাড়ির হক্ক আদায়
৫.স্বামীর হক্ক আদায়
৬.সবার সাথে ভালো ব্যবহার

এগুলোর মধ্যে স্বামীর হক অন্যতম।

যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে সে গরিব হলেও ধনী মনে করবে। তাকে সম্মান করবে। তার কোনো কথা অমান্য করবে না। তার অনুমতি ছাড়া কোনো কাজ শুরু করবে না। তার সন্তুষ্টিকে নিজের সন্তুষ্টির উপর প্রাধান্য দিবে। সব সময় তাকে আরাম ও শান্তি দেওয়ার চেষ্টা করবে।

সে যা দিবে তা-ই খুশিমনে গ্রহণ করবে। তাকে এতটা স্বস্তিতে রাখবে যেন সে তোমার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারে। সে যেন তার স্বল্প আয়ের কথা ভেবে মন খারাপ না করে। বরং স্বচ্ছন্দ ও প্রফুল্লতা অনুভব করে। সহযোগী সহকর্মীদের মাঝে মর্যাদা লাভ করে।

তার প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের আগে পুরা করবে। যথাসাধ্য তাকে ভালো খাওয়াবে। দারিদ্রকালে তার কাপড় চোপড় তুমিই সেলাই করে দিবে। তার যাবতীয় কাজ তুমি নিজে করে দিবে। অন্য কারো দায়িত্বে রাখবে না। নাস্তা ও খাবার নির্দিষ্ট সময়ের আগে প্রস্তুত করে রাখবে।

সংকটকালে তাকে পেরেশানীর কথা বলবে না। প্রয়োজন ছাড়া কোনো কিছু আনতে বলবে না। সেটা আনতে না পারলে তো তারও কষ্ট হবে তোমারও কষ্ট হবে। মনে করবে, তোমার ভাগ্যে সেই জিনিস থাকলে তুমি পেয়েই যাবে। অযথা চেয়ে লাভ কী?

ঘরের সকল কাজ যথাসম্ভব তুমিই করার চেষ্টা করবে। তার দায়িত্বে রাখবে না। কারণ, অনেকের ধৈর্য কম থাকে। এসব কাজের কথা বললে তাদের খুব কষ্ট হয়।

স্বামীর সাথে কেমন আচরণ কাম্য:

স্বামী ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে পেরেশানীমূলক কোনো কথা শোনাবে না। কারণ, জানা নেই সে এখন কোন পেরেশানী আছে, কোন কথা ভাবতে ভাবতে এসেছে। জানা নেই, এজাতীয় কথা শুনে এখন কোন হালত তৈরি হয়ে যায়।খাওয়ার সময় এমন বিষয়ে কথা বলবে যা শুনে তার মন খুশি হয়ে যায়। নিশ্চিন্ত মনে খেতে পারে। কারণ, মন ভালো থাকলে ডাল-ভাতও পোলাও কোরমার মতো স্বাদ লাগে। দুশ্চিন্তা পেরেশানীর সময় ভালো ভালো খাবারও বিস্বাদ লাগে। এটা পরীক্ষিত বাস্তবতা।

কোনো কোনো গৃহবধূ স্বামী বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে কী ঘটল কী ঘটছে সব শোনাতে শুরু করে। এতে স্বামীর উঠাবসা, খাওয়া-দাওয়া কষ্টকর হয়ে যায়। ফলে সে ক্ষুধা নিয়েই দস্তরখান থেকে উঠে যায়। এতে আল্লাহ তাআলাও নাখোশ হন, তারও মন বিগড়ে থাকে। এমন বেকুবী থেকে আল্লাহ তাআলা সবাইকে হেফাযত করুন।

আল্লাহ তাআলা তোমাকে সামান্য আকল বুদ্ধি দিয়ে থাকলে সেটুকু দিয়েই তুমি তার পেরেশানী দূর করার চেষ্টা করবে। মসিবত থেকে তাকে উদ্ধার করবে। সুচিন্তিত পরামর্শ দিবে। সান্ত্বনা দিবে। প্রশান্তি দিবে। অন্তত সমব্যথী হবে এবং পেরেশানী দূর করার ফিকির করবে।

তিনি ঋণগ্রস্ত হলে হস্তশিল্প বা নিজের অন্য কোনো মেহনতের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে তাকে ঋণমুক্ত করার চেষ্টা করবে। জমানো টাকা পয়সা থাকলে পেশ করবে। গহনা অলংকার খুলে তার হাতে দিবে। বলবে, এসব আপনার ঋণ পরিশোধের জন্য। তোমার বাবার বাড়ি থেকে দেওয়া গহনা হলেও পেশ করবে। নির্দ্বিধায় গহনা খুলে দিবে এবং পরবর্তীতে কৃপা প্রকাশ করবে না। এমন মনে করবে না যে, আমি সাহায্য না করলে কোনো উপায় ছিল না।

সন্তানকে দ্বীন শিক্ষা:

সন্তান যখন কথা বলতে শিখে, প্রথমেই আল্লাহর নাম শেখাবে। সে যেন 'আল্লাহ' শব্দ বলার আগে অন্য কোনো কথা না বলে। এমন কিছু শেখাবে না যা আজকালের মানুষ শিখিয়ে থাকে। তারা প্রথমেই বিভিন্ন ইংরেজি ও হিন্দি শব্দ শেখায়। তুমি সতর্ক থাকবে সে যেন এমন কোনো শব্দ নিজে নিজেও শিখতে না পারে। তার সামনে এজাতীয় কোনো শব্দ উচ্চারণ করা থেকে বিরত থাকবে। বাচ্চাদের দিল দেমাগ খুব পরিচ্ছন্ন থাকে। তারা খুব দ্রুত যে কোনো কথা শিখে ফেলে। এমন কিছু শিখে ফেললে সেটা হবে খুবই আফসোসের বিষয়।

সর্বোপরি তাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাম বলানোর চেষ্টা করবে। প্রথম থেকেই যেন সে আল্লাহ তাআলার নাম ও সত্তার সাথে পরিচিত হয়ে ওঠে। খুব সহজেই যেন সে তাঁর একত্ব, মহত্ত্ব ও বড়ত্বের কথা উপলব্ধি করতে পারে।

সে তোমার কাছে কোনো কিছু চাইলে বলবে, আল্লাহর কাছে চাও। তাকে কিছু দেওয়ার সময় বলবে, এটা আল্লাহ দিয়েছেন। এভাবে ধীরে ধীরে তার হৃদয়ে ঈমানের বীজ বুনতে চেষ্টা কর। সকল কাজের শুরুতে তাকে বিসমিল্লাহ বলতে শেখাও। নিজেরাও কাজের শুরুতে আওয়াজ করে বিসমিল্লাহ বল।

মোটকথা তাকে এমনভাবে গড়ে তোল যেন প্রথম থেকেই সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে চিনতে পারে।

কথা বলা শিখে গেলে তাকে কুরআন মাজীদের ছোট সূরাগুলো থেকে একটি একটি করে শব্দ শেখাও। সূরা ইখলাস, সূরা কাউসার ইত্যাদি সূরাগুলো এভাবেই মুখস্থ করিয়ে দাও। বুঝ বুদ্ধি হয়ে গেলে আয়াতগুলোর তরজমাও শোনাও। এরপর ধীরে ধীরে অন্যান্য সূরা মুখস্থ করাও।

বাচ্চাদেরকে অসৎসঙ্গ থেকে দূরে রাখ। সবসময় খেয়াল রাখ, যেন তাদের মন মানসিকতা অন্য কোনো দিকে ঝুঁকে না পড়ে।তাদের কোনো জিদ পুরা করতে যেও না। সেজন্য প্রয়োজনীয় কোনো জিনিস চাওয়ার আগেই তাকে দিয়ে দাও, যেন জিদ তৈরিই হতে না পারে। তার সঙ্গে এমনভাবে আচরণ কর যেন সে তোমার ব্যাপারে নির্ভয় হতে না পারে। তোমার ইশারা ইঙ্গিতই যেন তা হতে না পারে। তার সঙ্গে এমনভাবে আচরণ কর যেন সে তোমার ব্যাপারে নির্ভয় হতে না পারে। তোমার ইশারা ইঙ্গিতই যেন তার সতর্ক হওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়।

অতিরিক্ত মারপিট এবং বারবার কোনো বিষয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাক। তা না হলে বাচ্চারা নির্লজ্জ হয়ে যায়। তাই কেবল ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে কাজ আদায়ের চেষ্টা কর।

সবসময় শক্তভাবে কথা বলো না। ছোট ভুলগুলোর ক্ষেত্রে তাকে বুঝিয়ে দাও। রাগের মুহূর্তে যেন এমন কোনো কথা না বলে ফেল, যার কারণে পরে পস্তাতে হয়।

তার পক্ষ থেকে কাউকে গালমন্দ করো না। বরং কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে তার দোষকেই প্রধান মনে কর। এক্ষেত্রে কেবল তার কথার প্রতিই আস্থা রেখো না। অন্যদের কথাও শোনো। এরপর প্রতিটি কথা যাচাই করে দেখ। অন্তত পুরোপুরি যাচাইয়ের আগে কারও কথাকেই খাটো করে দেখো না। বাচ্চারা ভয় পেয়ে কখনো অসত্য কিছু বলতে পারে। ধোঁকার আচরণ করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে তুমি অবহেলা করলে সে বারবার এই সুযোগ গ্রহণ করতে চাইবে।

পড়ে থাকা জিনিস হাতে নিলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা ওই জায়গায় রেখে দিতে বল। সেই জায়গা দূরে হলেও সেখানে নিয়ে যেতে বল। তোমার পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব হলে তুমিও তার সঙ্গে যাও। এবং তোমার সামনেই জিনিসটি সেখানে রাখতে বল। ভবিষ্যতে যেন এমন কাজ না করে সে ব্যাপারে সতর্ক কর।

অন্যের কোনো জিনিসের সামনে তাকে দাঁড়াতে দিও না। এমন কোনো জিনিস যদি কেউ তাকে দিতে চায়, ভদ্রতার সাথে ফিরিয়ে দাও। অন্যের জিনিসের প্রতি যেন বাচ্চাদের লোভ বা আগ্রহ না হয়, সেই শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা কর।

মিথ্যা বলা, অন্যের দোষ বলা, কারও গীবত করা ইত্যাদি থেকে তাকে দূর রাখ। এসব করতে দেখলে নিষেধ কর। এসব যে খুবই মন্দ অভ্যাস সে কথা বুঝিয়ে বল।

তাকে শাসন করতে গিয়ে কখনো হেসো না। তার সঙ্গে অতিরিক্ত স্বাভাবিক হয়ে কথা বলো না। যাতে তোমার ও তার মাঝে থাকা আড়াল দূর না হয়ে যায়।

তার প্রতি অতিরিক্ত মহব্বত প্রকাশ করো না। কোনো ক্ষেত্রে তার অন্যায় পক্ষপাত করো না। সকল সন্তানকে এক নজরে দেখার চেষ্টা করো। একজনকে অপরজনের উপর প্রাধান্য দিও না। যাতে একে অপরকে অবজ্ঞা করার সুযোগ না পায়।

বাচ্চাদের হাতে কখনোই টাকা-পয়সা দিও না। কোনো জিনিস তাদের প্রয়োজন হলে তুমি নিজেই এনে দাও। সবার জন্য কোনো জিনিস আনলে সমানভাবে বণ্টন কর।

মিথ্যা বলা, অন্যের দোষ বলা, কারও গীবত করা ইত্যাদি থেকে তাকে দূর রাখ। এসব করতে দেখলে নিষেধ কর। এসব যে খুবই মন্দ অভ্যাস সে কথা বুঝিয়ে বল।

তাকে শাসন করতে গিয়ে কখনো হেসো না। তার সঙ্গে অতিরিক্ত স্বাভাবিক হয়ে কথা বলো না। যাতে তোমার ও তার মাঝে থাকা আড়াল দূর না হয়ে যায়।

তার প্রতি অতিরিক্ত মহব্বত প্রকাশ করো না। কোনো ক্ষেত্রে তার অন্যায় পক্ষপাত করো না। সকল সন্তানকে এক নজরে দেখার চেষ্টা করো। একজনকে অপরজনের উপর প্রাধান্য দিও না। যাতে একে অপরকে অবজ্ঞা করার সুযোগ না পায়।

বাচ্চাদের হাতে কখনোই টাকা-পয়সা দিও না। কোনো জিনিস তাদের প্রয়োজন হলে তুমি নিজেই এনে দাও। সবার জন্য কোনো জিনিস আনলে সমানভাবে বণ্টন কর।

বাচ্চাদের হাতে টাকা পয়সা দেওয়া এবং তাদের সকল ইচ্ছে পূরণ করতে চাওয়া মারাত্মক ভুল। এটা তার প্রতি মহব্বত নয়। এটা তার ক্ষতি করা।

মেয়েদের পর্দার বিষয়ে খেয়াল রাখা:

মেয়েদের পর্দার বিষয়ে খুব গুরুত্ব দাও। যখন থেকেই তাদের বুঝ-বুদ্ধি প্রকাশ পায়, সমবয়সী ছেলেদের থেকে পৃথক করে দাও। ছেলেদের সঙ্গে মিশতে দিও না। কথা বলার সুযোগও দিও না। অন্য মেয়েদের সাথেও তাদেরকে একাকি ছেড়ে দিও না। সবসময় তাদেরকে কাছে কাছে রাখ। নিজেদের মর্যাদা ও আল্লাহর বিধান

বুঝাতে শুরু কর। পর্দার গুরুত্ব ও উপকারিতা বুঝাতে চেষ্টা কর। উন্নত দ্বীনী চিন্তায় গড়ে তোলার মেহনত কর।

তাদেরকে অতিরিক্ত হাসি-তামাশায় অভ্যস্ত হতে দিও না। তাদের কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হলে নিজেই সঙ্গে নিয়ে যাও। তবে অযথা কোথাও নিয়ে যাওয়ার অভ্যাস করো না। মামা-খালাদের বাড়ি হলেও না। যদিও সেখানে যেতে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হলো রাস্তা-ঘাটে বের হওয়ার বদ অভ্যাস এবং অতিরিক্ত ঘুরাফেরার আগ্রহ। কারণ, একদিন তোমার সাথে গেলে আরেকদিন অন্যের সাথে যাওয়ার বায়না ধরবে। এভাবে অতিরিক্ত বেড়ানোর প্রতি আগ্রহ হয়ে যাবে, যা মাতৃজাতির জন্য অনুচিত। অতএব প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রেই পরিণাম চিন্তা কর। ছেলে-মেয়ে সবার ক্ষেত্রেই পরিণাম-চিন্তা খুব জরুরি।

মেয়েদের পর্দা সম্পর্কে বেশী সচেতন হও। অশোভন প্রতিটি কথা ও কাজে তাদেরকে সতর্ক কর। তাদের মাঝে যেন স্বাধীন মনোভাব তৈরি হতে না পারে, খেয়াল রাখ।

তাদের কাপড়-চোপড় ও অলঙ্কারাদির ক্ষেত্রে বিচার-বিবেচনা কর। এসব ব্যাপারে দ্বীনকে গুরুত্ব দাও। তাদের পছন্দের উপর ছেড়ে দিও না। তাদের জন্য মুসলিম নারীদের উপযোগী পোশাক ও অলঙ্কার নির্বাচন কর। এর ব্যতিক্রম করতে যেও না।

তাদেরকে যে কোনো ধরনের বই-পুস্তক পড়তে দিও না।

কুরআন ও হাদীসের কিতাব পড়তে উৎসাহিত কর। নামাযের ব্যাপারে তাগিদ অব্যাহত রাখ। তাদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষা দাও। কম কথা বলার নসীহত কর। বেশি কথা বলার ক্ষতিগুলো বুঝিয়ে দাও।

মেয়েদের ক্ষেত্রে লজ্জাশীলতা ও কম কথা বলা খুবই ভালো গুণ। তাছাড়া এই দুই গুণ সম্ভ্রান্ত মানুষেরও পরিচায়ক।

হাতের কাজ:

বাচ্চাদেরকে অলস বানিও না। তাদের মাধ্যমে কাজ নাও। মেয়েদেরকে হাতের কাজ শেখাও। কাপড় সেলাই করতে দাও। রান্না-বান্নার কাজে শরিক কর। কখনো কোনো তরকারি তাকে একাই রান্না করতে দাও। গৃহস্থালি কাজকর্মে তার সাহায্য নাও।
যেন এসব বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন হয়। এগুলো যেন সে খুব ভালোভাবে আঞ্জাম দিতে পারে।

সংসারের খরচপাতি তাকেই হিসাব করতে দাও। এরপর তার থেকে হিসাব বুঝে নাও। সবার জন্য কাপড়-চোপড় কেনা এবং ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের বিষয়গুলোও তাকে বুঝতে দাও। মোটকথা, যেসব বিষয় তোমার দায়িত্বে আসে এবং ভবিষ্যতে তার দায়িত্বেও আসবে বলে মনে হয়, সেসব বিষয়ে তাকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে দাও। তবে সব দায়িত্ব কেবল তার উপরই রেখ না, তাহলে সে চলে গেলে তোমার জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। তাকে শুধু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে দাও। সেটা এমনভাবে কর যেন তুমিও তার মুখাপেক্ষী না থাক, সেও তোমার মুখাপেক্ষী না থাকে।

বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজে যেন এতটাই দক্ষ হতে পারে যে, অন্যরাও তার থেকে উপকৃত হয়। এসব বিষয়ের অভিজ্ঞতা মেয়েদের জন্য খুবই জরুরি। মেয়েরা অভিজ্ঞ হলে অতি অল্প আয়েও খুব ভালোভাবে সংসার চালাতে পারে। এতে সবাই খুব আরাম ও স্বস্তি পায়। তারা সবার দুআ পায় এবং অশেষ সওয়াব লাভ করে।

তাই যথাসম্ভব মেয়েদেরকে সংসার পরিচালনায় অভ্যস্ত করে তোল। তাদেরকে অলস ও নিষ্কর্মা হতে দিও না। কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতা তাদেরই কল্যাণের জন্য।

সে একটু কাজ করলেই যদি তোমার মায়া লাগে, তাহলে কিছুদিন পর যখন অনেক দায়িত্ব একসাথে এসে পড়বে তখন কেমন লাগবে? তখন তো সেই প্রবাদের মতো হয়ে যাবে যে,

اب پچھتائے کا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت

পাখি ফসল খেয়ে ফেলার পর আফসোস করলেই আর কী হবে!

[অর্থাৎ সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার পর আফসোস করলেই আর কী হবে?!

পারিবারিক কথোপকথন কেন জরুরি:

আলাপচারিতা কী?

আপনারা অনেকেই হয়তো এই অদ্ভুত প্রশ্নটি শুনে অবাক হচ্ছেন। কারণ, প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি সংসারে টুকিটাকি বিষয় নিয়ে প্রতিদিন অসংখ্যবার কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা হয়ে থাকে। তাহলে যা আমাদের সকলেরই জানা তার উত্তর খুঁজতে যাওয়ার প্রয়োজনটা কী?

আসলে এমন অনেক পরিবার খুঁজে পাওয়া যাবে যেখানে স্বচ্ছন্দে আলাপ-আলোচনা করার মতো চমৎকার পরিবেশ রয়েছে। কিন্তু বিবাদ এড়িয়ে সহজে আলাপ করা যায় এরকম পরিবার নেই বললেই চলে।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের নিজস্ব চিন্তাচেতনা, কর্মকাণ্ড, মতামত, চাহিদা, পছন্দ ও আকাঙ্ক্ষা থাকে। এই মতবৈচিত্র্য পরিবারের স্বাভাবিক কথোপকথনে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই চিন্তাধারার ভিন্নতার কারণে মারাত্মক পর্যায়ের ঝগড়াবিবাদ সৃষ্টি হয়ে যায়। তখন মতভিন্নতাকে মাথায়

রেখে আলাপ-আলোচনা করাটা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। যদিও অল্পসংখ্যক মানুষই আলাপচারিতায় আগ্রহী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা কেবল তর্কবিতর্ক আর ঝগড়াবিবাদে জড়িয়ে পড়ে।

তর্কবিতর্ক ও আলাপচারিতা মূলত একই জিনিস। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই কোনো একটি ধারণাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজের দিকে টেনে আনার প্রচেষ্টা থাকে। কেউ হয়তো কোনো বিষয়ে তার মতামত ব্যক্ত করল, তখন এই মতের বিপরীতে অপর মানুষটি আরেকটি মতামত তুলে ধরল। প্রথম ব্যক্তিটি নিজের মতের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে অপর মতামতের ভুল খুঁজে বের করতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে। আর এভাবেই চলতে থাকে আমাদের তর্কযুদ্ধ, বাগবিতণ্ডা।

তর্ক করার সময় আমরা নিজেদের যুক্তিতে অটল থাকা এবং বাকিদের ওপর সেই যুক্তি চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। কথা বাড়তে বাড়তে একসময় আমরা চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিই, নতুবা কথার মাঝখানে উঠে চলে যাই। অনেক সময় তো নিজেকে সঠিক আর অন্যকে ভুল প্রমাণ করতে বানোয়াট প্রমাণাদিকে সত্য বলে চালিয়ে দিই। বিভিন্ন তথ্য ও ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই না করেই অপর মানুষটিকে অপদস্থ করার জন্য এটা-সেটা বলতে থাকি। অথচ ওই ব্যক্তি কী বলতে চাচ্ছে সে বিষয়ে কর্ণপাত করার বিন্দুমাত্র মানসিকতা রাখি না।

সংক্ষেপে বলা যায়, তর্ক হলো এক ধরনের বাগযুদ্ধ। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিনয়ের সাথে, সুন্দরভাবে ও সর্বোত্তম উপায়ে কথা বলার আদেশ দিয়েছেন। এতে করে কথোপকথন আমাদের জন্য উপকার বয়ে আনবে। আর সেটা তর্কবিতর্ক কিংবা ঘোরতর বিবাদে রূপ নেবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

তোমরা আহলুল কিতাবের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করবে। তবে তাদের মধ্যে যারা জালিম, তাদের সাথে নয়। তোমরা তাদের বলো, আমাদের প্রতি এবং

তোমাদের প্রতি যা-কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা ঈমান এনেছি। আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ একজনই এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী (১)

মহান আল্লাহ তাঁর রাসুলকেও একই কাজের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন-

প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে আপনি আপনার রবের পথে আহ্বান করুন। আর লোকদের সাথে বিতর্ক করুন সর্বোত্তম উপায়ে (২)

[১] সুরা আনকাবুত, আয়াত: ৪৬

[২] সুরা নাহল, আয়াত: ১২৫

যখন আমাদের মাঝে জ্ঞানের পরিমাণ, চারিত্রিক বিশুদ্ধতা ও ধৈর্য কম থাকে, তখন তর্কে জড়িয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক বিষয়। তবে এসব গুণ আমাদের মাঝে যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেই আমরা একটি সুন্দর কথোপকথন শুরু করতে পারি।

কথোপকথন হলো, কারো মতামতকে বিবেচনা করে দেখা এবং সেটা অসন্তোষজনক হলে খণ্ডন করা। মতামত নিয়ে আলোচনা করাও কথোপকথনের অন্তর্ভুক্ত। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারি, পৃথিবীতে নানান ধরনের মতামতের অস্তিত্ব রয়েছে। তবে যেকোনো আলোচনায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সবসময়ই থাকে।

প্রথমত, কথোপকথনে অপর পক্ষকে জোরপূর্বক নিজের মতামত বা চিন্তাভাবনা গছিয়ে দেওয়ার প্রবণতা কম থাকে। তবে কারো উদ্দেশ্য যদি হয় আলাপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সচেতনতা প্রতিষ্ঠা করা তা হলে অবশ্য ভিন্ন কথা। যেমন আলোচনার শুরুতেই অপর পক্ষকে বলা যায়- 'আজকের আমরা এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চাচ্ছি, যেগুলো আগে হয়তো কখনো খেয়াল করোনি। আশা করি, তুমি আমাকে এমন কিছু বিষয় ধরিয়ে দেবে। আমি তোমার কাছ থেকে কিছু শিখলাম,

আবার তুমিও আমার কাছ থেকে কিছু শিখলে। তুমি আমার কাছে তোমার মতামত তুলে ধরবে, আমিও আমার কিছু ভাবনাচিন্তা তোমার সাথে শেয়ার করব। তুমি আমাকে যেসব প্রস্তাব দেবে, সেগুলো আমি মানতেও পারি, আবার না-ও পারি। একই কথা তোমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই আমরা কেউ কাউকে কষ্ট দিয়ে কোনো কথা বলব না, কেমন?'

দ্বিতীয়ত, যেকোনো কথোপকথনে উপস্থিত মানুষগুলোর মাঝে দুটি মৌলিক বিষয় লক্ষ করা যায়। একদিকে, বিতর্কের বিষয়টি সম্পর্কে তাদের কিছু জ্ঞান এবং এই আলাপের পেছনে একটি উদ্দেশ্য থাকে। অপরদিকে তারা বিনয়ী আচরণ আর মার্জিত পদক্ষেপ বজায় রাখে।

বিশুদ্ধ মন-মানসিকতা থাকলে এই বিষয়গুলো মাথায় রাখার মধ্য দিয়ে যেকেউ তাদের আলোচনাকে ফলপ্রসূ, মার্জিত ও আনন্দদায়ক করে তুলতে পারে।

একটি পরিবারে এই ধরনের পরিবেশ বজায় রাখা সহজ কথা নয়। সন্তানদের নিরাপত্তা ও দেখাশোনার দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রত্যেক বাবা-মাই চিন্তিত থাকেন। তেমনিভাবে প্রয়োজনে তাদের সাথে বকাঝকা করাটাকেও তারা কর্তব্যের অংশ বলেই মনে করেন। এসব কারণে সন্তানের সাথে বাবা-মায়ের কথোপকথন এবং সহকর্মী-বন্ধু বা শত্রুর সাথে তাদের কথোপকথনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য থাকে। কিন্তু যখন আমরা একটি সুন্দর ও ফলপ্রসূ আলোচনার মূলভিত্তি মাথায় রেখে কথা বলব, তখন সেই শিক্ষা আমাদের সেরাটা দিতে সহায়তা করবে।

মনে রাখবেন-

> অধিকাংশ ঘরে স্বাভাবিক কথাবার্তার বদলে চলতে থাকে বাগযুদ্ধ আর তর্কবিতর্ক। এগুলো এখনই বন্ধ করা প্রয়োজন।

> তর্ক করার সময় আমাদের মূল লক্ষ্যই থাকে যেকোনো উপায়ে নিজের মতামতটি অন্যকে মেনে নিতে বাধ্য করা। এজন্য যদি আওয়াজ উঁচু করতে হয়, অপরজনের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করতে হয়, এমনকি আক্রমণাত্মকও হতে হয়, তাতেও আমাদের কিছু যায়-আসে না। এটা কোনোভাবেই সঠিক আচরণ হতে পারে না।

> কথোপকথন হলো এক ধরনের বিতর্ক, যা বিনয়ের সাথে করা হয়। যার মানে হলো, নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে আগ্রহভরে আরেকজনের কাছে ব্যাখ্যা করা। অন্যপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গিকে জোর করে পরিবর্তন করা নয়।

> আমাদের ভালোভাবে জেনে রাখা উচিত, কথোপকথনের একটি উদ্দেশ্য থাকা চাই। তাহলে আলোচনাটি সুফল বয়ে আনবে এবং অনর্থক কথাবার্তা কিংবা চিৎকার-চ্যাঁচামেচি থেকেও শত হাত দূরে থাকা যাবে।

> আসলে অংশগ্রহণকারীদের আচার-আচরণ নির্ণয় করার একটি মাধ্যম হচ্ছে কথোপকথন। এর দ্বারা ব্যক্তির ভদ্রতার পরিচয় প্রকাশ পায়।

> বাবা-মা চাইলেই সন্তানদের শাসন করতে পারেন, এই বিষয়টা কথা বলার সময় ভুলে যেতে পারলেই ভালো।

কথোপকথন কেন এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর সৃষ্টির মাঝে মতামত ও পছন্দের পার্থক্য রেখেই তাদের সুবিন্যস্ত করেছেন। পৃথিবীতে হুবহু একই চেহারার দুটি মানুষ খুঁজে বের করা যেমন দুষ্কর, তেমনিভাবে দুটি আলাদা সত্তার মাঝে একই রকম মানসিকতা, অনুভূতি ও চাহিদা খুঁজে পাওয়াও অসম্ভব। তাই ভিন্নমত পোষণ করা প্রতিটি ব্যক্তির সহজাত অধিকার। হোক সে খোকা কিংবা বুড়ো। যদি অসম্মতি প্রকাশ করা জন্মগত অধিকার হয়েই থাকে, তবে অপর মানুষটির অসম্মত হওয়ার

বিষয়টি মেনে নেওয়াটাও কিন্তু কর্তব্যের মাঝেই পড়ে। এ কারণেই আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদের ব্যাপারে বলেছেন-

যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দেয়, সালাত আদায় করে এবং নিজেদের সকল কাজ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে চালিয়ে নেয়, আর আমি তাদেরকে যতটুকু রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।-সূরা শুরা: ৩৮

ইসলামে শুরা তথা পারস্পরিক পরামর্শের ধারণাটি কেবল রণাঙ্গন, রাজনৈতিক প্রাঙ্গণ, কর্মক্ষেত্র বা পরিবারের ভেতরই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি একটি জীবনপন্থা। বয়সে ছোটরা বড়দের প্রশ্ন করবে, আবার বয়সে প্রবীণরাও ছোটদের কাছ থেকে অজানা বিষয়গুলো জেনে নেবেন। তারা একে অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং মীমাংসায় পৌঁছানোর জন্য নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ ও আলাপ-আলোচনা করে নেবে।

প্রকৃতপক্ষে, জীবনের প্রতিটি দৃষ্টিকোণকে দেখার এটাই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। আমি এখানে পরিবারের মানুষগুলোর মধ্যে আলাপচারিতার গুরুত্ব এবং একে অবহেলা করার কারণগুলো ব্যাখ্যা করব-

এক.

সন্তানের লালনপালন মা-বাবা ও সন্তানের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করে। এই সম্পর্ক যত আন্তরিক ও গভীর হবে, ততই শিশুর কোমল হৃদয়টি বাবা-মায়ের প্রতি অনুরক্ত হতে শুরু করবে।

একটি শিশুকে এমন পরিবেশ করে দেওয়া উচিত যেন সে খোলাখুলিভাবে মা-বাবার কাছ থেকে অজানা বিষয়গুলো জেনে নিতে পারে। সে সরলচিত্তে ও অকপটে নিজের আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন বা সমস্যার কথা বলার স্বাধীনতা পেলে তার ব্যক্তিত্বে বড় ধরনের একটি পরিবর্তন আসবে। যেমনিভাবে পানির পরশ পেলে লবণের মাঝে

পরিবর্তন চলে আসে। পানির সাথে বিক্রিয়া করে লবণ এক নতুন রূপ ধারণ করে। পানিতে দ্রবীভূত হয়ে লবণ কেবল পানির দ্বারা প্রভাবিতই হয় না বরং পানির স্বাদ পাল্টে দিয়ে পানিকেও প্রভাবিত করে।

ধরুন, এক ভদ্রলোকের সাথে তার স্ত্রীর বোঝাপড়ার সম্পর্কটা খুব দারুণ। সময় নিয়ে, কথাবার্তা বলার মাধ্যমে তিনি অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান অনায়াসে করে ফেলতে পারেন। স্ত্রী তার স্বামীর এই গুণটি নিজের মাঝেও ধারণ করার চেষ্টা করেন। একইভাবে সন্তানেরাও তা থেকে শিক্ষা নেয়। নিজেদের মধ্যে বা বাবা-মায়ের সাথে কথা বলার সময় এই শিষ্টাচারগুলো প্রয়োগ করে। কারণ, উত্তম কথোপকথন বোঝাপড়ার সুযোগ করে দেয়। আর অন্যের দৃষ্টিভঙ্গিকে জোর করে পরিবর্তন করার চেষ্টা, অপরকে পরাস্ত করার ব্যতিব্যস্ততা এবং নিজের মতামতকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা কেবল সম্পর্কে ভাঙনই তৈরি করে দেয়। এতে একে অন্যকে ইতিবাচকভাবে বোঝানোর বা পরিবর্তন করার সম্ভাবনা ক্রমেই কমে আসতে থাকে।

দুই.

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষা হলো পারস্পরিক সম্পর্ক। পারস্পরিক সম্পর্কবিহীন কোনো শিক্ষাই পরিপূর্ণ নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য, সন্তানের ব্যক্তিত্বকে গঠন করা এবং তাকে অনাগত জীবনের জন্য প্রস্তুত করে তোলা। আমরা শিক্ষাকে প্রায়ই 'ম্যাচিউরিটি বিল্ড-আপ' করার কাজে ব্যবহার করে থাকি, যেন তারা জীবনের সর্বোচ্চ সুবিধাটুকু অর্জন করতে পারে।

কথোপকথন একটি নিরাপদ পারস্পরিক সম্পর্ক এবং শিশুর দৃঢ় ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলাকে নিশ্চিত করে। তাকে সহানুভূতিশীল ও ধৈর্যবান হতে শেখায় এবং জীবনযুদ্ধের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করে।যখন আমরা কোনো শিশুর সাথে কথা বলি, তখন তার মাঝে সমতার অনুভূতি বিলিয়ে দিই। সে ধীরে ধীরে একজন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত হয় এবং নিজের মুখের কথার মান রক্ষা করার চেষ্টা করে। সে তার মতামতের স্বপক্ষে যুক্তিসংগত কথা বলে।

শোনাকথার গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা বোঝার চেষ্টা করে। একইসাথে অযৌক্তিক কথার ত্রুটি ধরিয়ে দিতে কিংবা সংশোধন করতে পারে।

আসলে শিশুর সাথে এমনভাবে কথা বলা উচিত যেমন করে সিংহী তার বাচ্চাকে বাচ্চাকে খেলার ছলে শিকারবিদ্যা শিখিয়ে দেয়।
পরিবার প্রতিরক্ষা

পরিবার প্রতিরক্ষা:

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যে বাস্তবতাবিবর্জিত ও থার্ড়ক্লাস কলোনিয়াল স্লেভ নির্মাণ কারখানা, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, আমাদেরকে শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়েই আত্মরক্ষা শেখানো হয় না। এক অলীক অবান্তর ধারণা আমাদের মনে গেঁথে দেওয়া আছে। সিনেমার শেষ দৃশ্যে পুলিশ এসে বার বার বলেছে 'আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না'। তবু আমাদের হুঁশ হয়নি যে, নায়ক একটু আগেই আইন হাতে তুলে না নিলে নায়কপক্ষ সবাই মারা পড়ত ভিলেনের হাতে। পুলিশের কাজ ঘটনা ঘটে যাবার পর আসা। পুলিশ গণক-জ্যোতিষী বা জিন না যে, ভবিষ্যত আন্দাজ করবে। ঘটনার আগে পুলিশ এসেছে, এমনটা সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি হয়নি, হতে পারে না। সুতরাং আপনার নিরাপত্তা পুলিশ দেবে না, দিতে পারে না। আপনার নিরাপত্তা আপনার নিজেকেই নিশ্চিত করতে হবে। আপনার পরিবারের নিরাপত্তা আপনাকেই নিশ্চিত করতে হবে। আয়াত নামের ফুটফুটে মেয়েটার খুনীকে পুলিশ ধরে দেবে, টুকরো টুকরো লাশ খুঁজে এনে দেবে। কিন্তু খুন ঠেকাতে হবে আপনাকে, একা আপনাকে। পুরুষ মানুষের মতো এত বড় বালাই আর নেই।

পুরুষাঙ্গ থাকলেই পুরুষ হওয়া যায় না। পুরুষ 'হওয়ার জিনিস'। পুরুষ হয়ে উঠতে হয়। ডিফেন্ড ইয়োর ফ্যামিলি। Warrior instinct কোথায় আমাদের? আমরা রাষ্ট্রের ওপর ভরসা করে বসে আছি যে, রাষ্ট্র আমার ঘরে বডিগার্ড নিযুক্ত করে দেবে এই আশায়? কীসের ভরসায় আপনি নিশ্চিন্ত? আপনার ছেলেমেয়ে স্কুলে

যায়, কার ভরসায় আপনি নাকে তেল দিয়ে ঘুমান? এর-ওর কাছে আমরা সন্তানকে রেখে দিই, গ্যারান্টি কী? ঘটনার পর আদালতের কক্ষে 'জেলে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা' শাস্তি? ব্যস? শেষ? খুশি? কোথায় পুরুষ? কোথায় পুরুষালি রুখে দাঁড়ানো? কোথায় টেস্টোস্টেরনের গায়রত?

১. পরিবারের নিরাপত্তা নিজে নিশ্চিত করুন। কারও ঠ্যাকা নেই।

২. নিজে, স্ত্রী ও সন্তানাদি প্রত্যেকে স্ব-উদ্যোগে আত্মরক্ষা কৌশল শিখুন ও শেখান।

৩. অস্ত্র যাদের লাইসেন্স করার সুযোগ আছে, করে নিন।

৪. যাদের সুযোগ নেই, মোটা লাঠি সাথে রাখুন। সুন্নত হিসেবে। স্ত্রী-কন্যাকেও মোটা লাঠি সাথে রাখতে বলুন। সাথে হাতিয়ার দেখলে পটেনশিয়াল অপরাধী নিজেকে সামলাবে, এটা হিউম্যান সাইকোলজি।

৫. শিশু সন্তানকে মা-বাবা ছাড়া অন্য কারও কাছে রাখবেন না। কাছ-ছাড়া করবেন না। নিকটবর্তী স্কুলে দিন। দূরের স্কুলে এমন আহামরি কিছু শেখায় না। স্কুলের পর দীর্ঘসময় যেন সে স্কুলে না থাকে।

৬. বিশ্বাস কাউকেই করার দরকার নেই। এটা মধ্যযুগ না। এটা শিল্পায়ন-পরবর্তী পুঁজিবাদী ও উপনিবেশ-পরবর্তী লুটেরা যুগ। এখানে শিক্ষাব্যবস্থায় তৈরি হয় শিক্ষিত, অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত পশু। কোনো-না-কোনো দিক দিয়ে পশু।

৭. সামনের বছর দুর্ভিক্ষের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়বে অপরাধ। পুলিশ কোনোদিন ঠেকায়নি, ঠেকাবে না। আপনি ঠেকাবেন। কীভাবে ঠেকাবেন, ভাবুন। নিজে ভিকটিম না হবার জন্য কী কী করবেন, ভাবুন।

৮. নিজে শক্তিশালী হতে হবে। সন্তানদেরকে শক্তিশালী বানাতে হবে। সবল না হতে পারলে অন্য কোনো সবল আপনাকে হজম করবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সবল মুমিন আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়, যদিও সব মুমিনের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে।।

৯. হাফলেডিস লিবারেল চিন্তা থেকে বের হোন। নিজেকে নিজে রক্ষা করুন।

এই সিস্টেমটাই এমন যে, আয়াতের খুনীর মতো হাজারও খুনী তৈরি করে এই সিস্টেম। জনসমক্ষে শিরশ্ছেদ হয় না বলে সমাজ শেখে না। সোশ্যাল কন্ডিশনিং হয় না। হাজারও পটেনশিয়াল খুনীর হাত কাঁপে না। সিস্টেমও আয়াতের খুনী, আয়াতের টুকরোকারী।

(লিবারেল সেক্যুলার সিস্টেম নিপাত যাক।

এই শিক্ষাব্যবস্থা ব্যর্থ
এই বিচারব্যবস্থা ব্যর্থ
এই রাষ্ট্র-সমাজ ব্যবস্থা ব্যর্থ আমাদেরকে নিরাপত্তা দিতে।
ফাল্গু কুল্লা নিজামিন...)

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'দুর্বল মুমিন অপেক্ষা সবল মুমিন শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়। (তবে) প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ আছে। তোমাকে যা উপকার দেবে সে বিষয়ে প্রলুব্ধ হও, আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো। অক্ষম অকর্মণ্য হয়ো না। কোনো (অবাঞ্ছিত) বিষয়ে আক্রান্ত হলে বোলো না, যদি আমি এটা করতাম তাহলে এটা এটা হতো; বরং বলবে আল্লাহর ফয়সালা; তিনি যা চান তা-ই করেন। কারণ, 'যদি' কথাটা শয়তানের কাজের পথ খুলে দেয়।' (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৬৬৪)।

পুরুষের ভূমিকা:

সমস্ত বাতিল মতবাদ আর সমস্ত জুলুমতন্ত্র একটা জিনিসকে খুব ভয় করে। পুরুষের পুরুষালিবোধ (sense of masculinity)। কারণ, আত্মমর্যাদাবোধ, গায়রত, অধীনতা মেনে না-নেওয়ার পুরুষালি বৈশিষ্ট্য যেকোনো মানবরচিত সিস্টেমের জন্য হুমকি। পুরুষের এই পুরুষালিভাবের আধিক্যকে সবাই ভয় পায়। এ জন্য বিভিন্ন প্রকল্প দ্বারা এটাকে নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করার কৌশল অবলম্বন করে জালিম কাঠামো। যেমন ধরেন:

'সমতা'র প্রতারণামূলক একটা কনসেপ্ট ছেলেদের গেলানো হবে। যদিও সবাই জানে, আমরা সমান নই। কখনোই আপনি আপনার স্ত্রীকে দাঁড় করিয়ে নিজে বসবেন না, বা শপিং-এ তাকে ব্যাগ বহন করাবেন না। আমরা সমতুল্য, কিন্তু সমান নই। আমরা পরিপূরক। কিছু বিষয়ে আমি তার ওপর, কিছু বিষয়ে সে আমার ওপর নির্ভরশীল, এভাবে একটা চক্র পূর্ণ। কিন্তু আলাদাভাবে আমরা পরস্পরের সমান বা বিকল্প নই। যখনই পুরুষ নিজেকে নারীর সমান ভাবছে, সে নিজের স্বাতন্ত্র্যবোধকে ছেড়ে দিচ্ছে। নারীর ওপর তার পুরুষালি স্বাভাবিক দাবিগুলো ছেড়ে দিচ্ছে, বিপরীতে নারী কিন্তু নারী হিসেবে তার দাবিগুলো ছাড়ছে না। ফলে পুরুষ পরিণত হবে দাসে, চক্র অসমাপ্ত থাকবে। ৮০% নারী নির্যাতন কেস ভুয়া। *০) সমাজে পুরুষই এখন নির্যাতিত। এর কারণ হলো, পরিপূরকতাকে না মেনে আপনি সো কল্ড সমতার টোপ গিলে নিজের বিগুলো ছেড়ে দিয়েছেন।

এমনি করে পশ্চিমা বিভিন্ন প্রকল্প মোটামুটি একটা এন্টি-পুরুষত্ববোধ বা পুরুষত্ব-হ্রাস (de-masculanization) অবস্থানে। একটু দেখি, চলেন। আপাতত নিজে ভাবুন, কীভাবে এগুলো ভেতরের পুরুষত্ববোধকে কমায়।

সো-কল্ড সমতা, নারীবাদ।

পর্নের সহজলভ্যতা।

সমকামী আন্দোলন।

সহশিক্ষা, সহকর্ম দ্বারা নারীর প্রতি অনুভূতি ভোঁতাকরণ।

একাধিক বিবাহের প্রতি সামাজিক ঘৃণা।

ভোগবিলাসী জীবনকে আরাধ্য বানানো।

কার্টুন ইত্যাদি দ্বারা পুরুষায়ন পিছিয়ে দেওয়া।

পরিবারকে সময় দেওয়া অসম্ভব করে দেওয়া। বাবা-ছেলে দূরত্ব তৈরি।

ফ্যাশন-ফুড-খেলাধুলার দিকে ছেলেদের আকর্ষণ তৈরি।

জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতি।

পুরুষালিবোধ চর্চা করুন। পুরুষত্ব মানে বউ পেটানো না। যার যেটা নাই, সেই সুযোগে তার ওপর সেটা খাটানোকে পুরুষালি বলছি না, বলে না। দুর্বলের ওপর প্রবল হওয়া কাপুরুষতা। সিনেমা-টিনেমায় দেখতাম না? অপোনেন্টের তরবারি পড়ে গেলে আবার এগিয়ে দেয়। এটা হলো পুরুষালি। এ জন্য পুরুষালি-বোধ চর্চা করুন এভাবে:

নারীকে দুর্বল (নেগেটিভ অর্থে নয়) ভাবুন। সমতা দিয়ে নারী নির্যাতন দূর হবে না। নারী দুর্বল (নেগেটিভ অর্থে না), পরিপূরক এবং অবদানে সমতুল্য। এটা প্রতিষ্ঠিত হলে নির্যাতন দূর হবে। নারীর অবদান ও দুর্বলতা সবার মনে প্রোথিত হতে হবে। বুঝাতে হবে, নারী আপনার প্রবলতা দেখানোর জায়গাই না। আপনার শান এটা না যে, আপনি নারীর ওপর শক্তি খরচ করবেন। আমার গায়রতে লাগা চাই, ছিঃ একটা নারীর ওপর আমি প্রবল হলাম, এই আমার লেভেল। ছিঃ!

নারীর জন্য নিরাপত্তা, আরাম, কমফোর্ট নিশ্চিত করে নিজে কষ্ট বেছে নিন। সব ক্ষেত্রে। রক্ষক হিসেবে নিজেকে চর্চা করুন।

গাড়ি, টাকা, ফ্যাশন, ইলেক্ট্রনিক্স, গেমস, প্রিমিয়ার লীগ, ক্রিকেট এসবকে প্যাশন বা শখ বানাবেন না। রুক্ষ ও ব্যস্ত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হোন। কম খান, পুষ্টিকর খান। নিজেকে অবসর কম দিন।

নজরের কঠোর হেফাজত করুন। অনলাইন-অফলাইন সবখানে। নারীত্বের প্রতি সেন্সিটাইজেশন বাড়বে। যত নারী দেখবেন, যত নারীর সাথে মিশবেন, তত নারীত্বের প্রতি ডিসেন্সিটাইজড হবেন। অনুভূতি ভোঁতা হবে।

সন্তানকে কঠোর বাস্তবতা শেখান। কার্টুন, সুপারহিরো এসব দিয়ে অলীক জগত গড়ে দেবেন না। তাকে বুঝাতে হবে যে, কেউ উদ্ধার করতে আসে না। নিজেকেই লড়াই করতে হয়।

. সাদাসিধে পোশাক পরুন। বেশি নকশা, বেশি দামী কাপড়, বেশি মোলায়েম কাপড়, রেশম পরিহার করুন। সুন্দর থাকুন, গাম্ভীর্য বজায় রাখুন। বেশি টিপটপ, বেশি খুঁতখুঁতে হবেন না পোশাকে।

চেহারা, চুলের স্টাইল, কসমেটিক্স এসব নিয়ে আগ্রহ কমান।

পুরুষের পরিপূর্ণতা:

আমার স্বল্পজ্ঞানে, দুনিয়ার যেকোনো নারীকে 'সুখী' রাখার আত্মবিশ্বাস আপনাকে একটা পূর্ণতার অনুভূতি দেবে। এটা যে কত বড় কনফিডেন্স, যে এটা হাসিল করেছে সে টের পাবে। সুখী করার মাঝে যৌনতা একটা অংশমাত্র। নারীকে যৌন-অযৌন, শারীরিক-মানসিক সবদিক দিয়ে সুখী করার কায়দা রপ্ত আছে আপনার, মানে আপনি এখন আলফা মেল হওয়া শুরু করতে পারবেন।

এ জন্য দাম্পত্যজীবনে আপনাকে সুখী হতে হবে। আপনার স্ত্রীকে যখন আপনি সবদিক দিয়ে সুখী করতে পারলেন, তখন এই আত্মবিশ্বাস আপনার মাঝে এলো যে, পৃথিবীর যেকোনো নারীকে খুশি রাখার সামর্থ্য আপনার আছে, সে কায়দা আপনি জানেন। অনেক ভাই মাসনা নিয়ে ভাবছেন বা ভেবে থাকেন। প্রথমাকে টেক্কা দিতে না, বরং প্রথমাকে জয় করে আপনি রাজ্যবিস্তারে মন দেন, এটা আমরা চাই।

চাহিদার ক্রমবিন্যাস পিরামিডে মনোবিদ আব্রাহাম মাসলো দেখিয়েছেন, প্রাথমিক চাহিদা (খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয়-যৌনতা-পেশাব পায়খানা ইত্যাদি) পূরণ হলে মানুষের মাঝে জন্ম নেয় পরবর্তী ধাপের চাহিদাগুলো। সেগুলো হলো: নেতৃত্ব, প্রভাব বিস্তার, প্রতিপত্তি, নিজের মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠা, মিশন। একটা জাতির শতভাগ পুরুষ প্রথম ধাপেই আটকে থাকলে চলবে না। আমরা চাই দ্বিতীয় ধাপের চাহিদাগুলো পূরণে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যান। সংসার হোক আপনার আত্মবিশ্বাসের জোগান। সংসার কোনো পিছুটান বা টেনশন বা হীনম্মন্যতার কারণ না হোক। কনফিডেন্সের সাপ্লাই হোক সংসার।

আমরা আলফা মেল বলতে বুঝাচ্ছি, আপনি একজন পুরুষ, যার একটা সার্কেল আছে। যে সার্কেলটাকে লীড দিয়ে আপনি একটা মিশন একমপ্লিশ করতে পারেন। এরকম পুরুষ হতে হবে আপনাকে। সাহাবিরা এমন ছিলেন। প্রত্যেকেই নেতৃত্বের যোগ্য। অফিসে, মসজিদে, আড্ডায় আপনার একটা সার্কেল হোক। সেই সার্কেল নিয়ে আপনি কাজ করবেন, আপনার মিশনের পথে এগোবেন। এই শতাব্দী 'সভ্যতার সংঘাতের' শতাব্দী। ইসলামি সভ্যতাকে শক্তিশালী করা আপনার মিশন। একজন ভবিষ্যত বিশ্ব-রাজনীতি নিয়ে উদাসীন, আখিরাত নিয়ে উদাসীন একজন মানুষকে যদি আপনি দ্বীন-সচেতন করতে পারেন, ইসলামকে একটা সভ্যতা হিসেবে চেনাতে পারেন, সেটা দ্বীনের মিশন বিজয়।

দুইটা বিষয় ঘটে গেছে। নারীরা নিজেদেরকে পুরুষের সমানে সমান ভাবার সাথে সাথে পুরুষও নিজেকে নারীর সমানে সমান ভাবা শুরু করেছে। ফলে পুরুষ তার

পুরুষালি ভূমিকা ভুলে নারীকে প্রতিযোগী ভাবছে। যেমন ধরেন, কমন একটা জোক হলো: মহিলা সিট ছাড়া অন্য সিট ছাড়ব না মেয়েদের জন্য। কেন? ওরা ভাবে ওরা সমান, তাই। যদি দুর্বল ভাবত, তাহলে ছাড়তাম। মানে পুরুষও নারীকে প্রতিযোগী ভাবল। ঠিক এই জেন্ডার স্ট্রেসটাই পশ্চিমা পুঁজিবাদী দর্শন চায়। ফেমিনিজমের প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমে জন্ম নিয়েছে মেনিনিজম (পুরুষবাদ)। নারীবাদ যেমন পশ্চিমা দর্শনের সন্তান, পুরুষবাদও তাই।

পশ্চিমা নারীরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে নারীস্বাধীনতার ফল। তারা স্বামী-বাপ-ভাইয়ের 'কাওয়াম'-শীপকে অস্বীকার করেছে। মুক্তির তৃষ্ণায় আকণ্ঠ পান করে নিয়েছে 'স্বাধীনতা' নামক গরল। পশ্চিমা নারী যতই পুরুষ হয়ে উঠতে চাচ্ছে, ততই নারীত্ব দিয়ে মাশুল দিতে হচ্ছে তাদের। স্কুল-কলেজে এক দফা। রিলেশনশীপে এক দফা। অফিসে এক দফা। বিচার চাইতে গেলে সেখানে আরেক দফা। ক্ষমতায়নের আইকন হতে গিয়ে মিডিয়াপাড়ায় কয়েক দফা। ট্রমাটাইজড হয়ে সরকারি এসাইলামে আরেক দফা। হাসপাতালে আরেক দফা। যাবার আর কোনো জায়গা নেই। বাপ-ভাই-স্বামী সবার ছায়াকে সে অস্বীকার করেছে আগেই। আমার কোনো ছায়া দরকার নেই। আমি কম কীসে? আমি নিজেই পুরুষের সমান। কামাই থাকলে জামাই লাগে না (ওদিকে বস কিন্তু ঠিকই ট্যুরে নিয়ে যায়। ডাস্টবিনে পড়ে থাকে শিশু, যেন হস্তমৈথুনের পর কমোডে পড়ে থাকা বীর্যের চেয়ে বেশি দাম নেই মানবভ্রূণের। হুবহু একই ধ্বংস ঘটাতে চাচ্ছে লিবারেল মিশনারীরা প্রাচ্যেও প্রাচ্যের সমাজ যদি এদের প্রতিহত না করে, অচিরেই (সকল লক্ষণ অলরেডি প্রকাশ পাচ্ছে) আমাদের মেয়েরাও একই পরিণতি বরণ করবে। আমাদের মেয়েরা আজও যেকোনো ইন্টারপার্সোনাল থ্রেট সিচুয়েশনে পরিবারে আশ্রয় নিতে পারে। 'তোর ঘরে কি মা-বোন নেই'... বাক্যটাও শেষ মুহূর্তেও নারীর আদি ভূমিকা স্মরণ করাতে চায়। যে ভূমিকাগুলো তাদের রক্ষাকবচ ও রক্ষাব্যূহ ছিল। সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে তারা কাওয়াম হিসেবে নিয়েছে অন্য পুরুষকেই... 'বস'-কে।

আমাদের করণীয় হলো, পুরুষের পুরোনো ভূমিকাকে ফিরিয়ে আনা। পুরুষ রক্ষক। এটাই পুরুষের ভূমিকা। পুরুষ নারীর প্রতিযোগী নয়। নারী নিজেকে প্রতিদ্বন্দ্বী

ভাবতে পারে, আমরা ভাবি না। প্রতিদ্বন্দ্বিতা তো সমান যোগ্য কারও সাথেই হয়। নারী ও পুরুষ যোগ্যতায় সমান, এটাই আমরা মানি না। বায়োলজি ও সাইকোলজি মানে না। বরং বায়োলজির দাবি এটাই যে, নারীর একজন কাওয়াম লাগবে, যে সিদ্ধান্ত দেবে। হরমোনাল ইনডিসিশন, উদ্বিগ্নতা, অল্প স্ট্রেসে অস্থিরতা, দ্বিধা ইত্যাদি হরমোনাল বায়াস তাকে বলে যে, তার একজন কাওয়াম লাগবে। টেস্টোস্টেরনওয়ালা কাউকে লাগবে, যে তার হরমোনাল অস্থিরতায় তার রক্ষক হবে, হরমোনাল দ্বিধায় তার সিদ্ধান্তদাতা হবে। হরমোনাল কাতরতায় শক্ত পেশল হাতে তাকে তুলে নেবে প্রশস্ত বুকে। সকল দায়িত্ব নেবে চওড়া কাঁধে। মচকাবে কিন্তু ভাঙবে না। জান দেবে, কিন্তু মান দেবে না। আবার ওদিকে পুরুষের লাগবে একজন সদা-সন্দিগ্ধ পরামর্শক। অগ্রপশ্চাৎ নিয়ে অস্থির একজন চপল পরামর্শক। অল্পে উদ্বিগ্ন এক সযত্ন পরামর্শক। যে তার টেস্টোস্টেরন-ঘটিত বেপরোয়া সিদ্ধান্তে বাধা হবে। এ জন্য আমরা মুরব্বিদের বলতে শুনি: 'বিয়ে দিয়ে দাও, বিয়ে দিলে ঠিক হয়ে যাবে'। এবং যায়ও। বিয়ের পর লোকে মদগাঁজা ছেড়ে দেয়, লাম্পট্য ছেড়ে দেয়, মস্তানি-গুন্ডামি ছেড়ে দেয়, রিস্কি জীবনযাপন ও অভ্যাস ছেড়ে দেয়। এভাবে একটা ব্যালেন্স হয়।

শিশুর মতো আগলে রাখতে হয় নারীকেও। এটা ব্রেইন ম্যাপিং এর দুরুন। শিশুর মতোই সে অনেক কিছু বুঝতে চায় না। নন-ইস্যুকে ইস্যু আর অদরকারিকে দরকারি ভাবা, ভুলে যাবার জিনিস মনে রাখা, জেদ, যুক্তির ওপর আবেগের প্রাধান্য, হিসেবের চেয়ে জবানের প্রাধান্য, পর্যবেক্ষণ ডিটেইল কিন্তু শর্টটার্ম। এগুলো সব মাতৃগর্ভে নারীভ্রূণের হরমোন-বিধৌত ব্রেইনম্যাপ। আমরা কি শিশুকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবি? চল্লিশ বছরের পুরুষ কি দশ বছরের শিশুকে প্রতিযোগী ভাবে? নারীও তেমনি। ভালেবাসা আর মমতা ছাড়া আর কিছু পুরুষের দেওয়ার নেই।

ইসলামিক পরিবারের রূপরেখা:

হালাল পন্থায় জীবিকা নির্বাহ:

ইদানীং সম্পর্কগুলো খুব জটিল হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি কাজ ভুল পথে এগুচ্ছে। মানুষ যে পথে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করছে তার ওপর এর প্রভাব পড়ছে। অন্যের অধিকারের কথা বিবেচনা না করে নিজেদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা করছে। বর্তমান বিশ্বঅর্থনীতি ও শ্রমবাজার অমুসলিম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই অর্থনীতি ও সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে তারা ইসলামি রীতিনীতি ও ইসলামি শিক্ষার মূল্যায়ন করে না। এতে সম্পদ অর্জনের জন্য মানুষ দুর্নীতির পথ বেছে নিচ্ছে।তো একজন মুসলিম নিজের উপার্জন হালাল উৎস থেকে আসছে কি না সেই দিকে নজর দেওয়ার পাশাপাশি এটাও খেয়াল করবে যে, তার উপার্জিত অর্থ হালাল পথে ব্যয় হচ্ছে কি না। যেমন: আমরা যে খাবার ও পানীয় গ্রহণ করি সেটাও আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় হালাল-হারাম বিবেচনা করেই করতে হবে। আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের হালাল পথে উপার্জনের নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন-

হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদের যা দিয়েছি তা থেকে পবিত্র জিনিস খাও এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো যদি তোমরা কেবল তাঁরই উপাসনা করে থাকো [১]

এই আয়াতে 'বিশুদ্ধ' বলতে আল্লাহ তাআলা 'বৈধ উপায়' কে বুঝিয়েছেন। হালাল জিনিস তো সেটাই যা হালাল পন্থায় উপার্জিত হয়।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'এমন এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি দীর্ঘ সফর শুরু করেন। এরপর ধুলোবালিতে জর্জরিত হয়ে আল্লাহর সমুখে হাঁটুগেড়ে বসেন। মিনতির সাথে

আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে তিনি দুআ করেন। 'ইয়া রব, ইয়া রব', বলে চোখের পানি ফেলতে থাকেন!

যার পোশাক-আশাক, খাবার-পানীয় সবকিছুই হারাম পথে উপার্জিত, তার দুআ কীভাবে কবুল হবে?'[২]

এই হাদিস থেকে এটা পরিষ্কার যে, যিনি অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জন করে বেঁচে আছেন, মহামহিম আল্লাহ তার দুআ কখনো কবুল করেন না। কিছু আলিমের মতে, আল্লাহ তাআলা শুধু যে এদের দুআ কবুল করা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখেন তা-ই নয়, বরং তিনি এদের সাধারণ কাজগুলোও কবুল করেন না।

[১] সুরা বাকারা, আয়াত: ১৭২

[২] সহিহ মুসলিম: ১০১৫; জামি তিরমিযি: ২৯৮৯

কথা বলার দক্ষতা:

অধিকাংশ মানুষের জানা নেই-যুক্তি, বুদ্ধি, অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া প্রকাশে ভাষার গুরুত্ব কতখানি। আমাদের উন্নয়নে ভাষার দুর্দান্ত প্রভাব অনস্বীকার্য। আমাদের যুক্তি ও অনুভূতি প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম হলো ভাষা। আমরা কোনো বিষয়ে চিন্তা করতে ও চিন্তার প্রতিফলন ঘটাতে ভাষার ব্যবহার করি। শব্দের পরে শব্দ গেঁথে বাক্য তৈরি করি। বাক্যগুলো মুখে বললেই মনের ভাব প্রকাশ করা হয়। মনের কথার, অনুভূতিগুলোর চিত্রায়ণ করে এই বাক্যগুলো। কথা দিয়েই মানুষ সম্পর্কে একজন মানুষ জানতে পারে, মানুষকে মানুষ চিনতে পারে। এ কারণেই মহামহিম আল্লাহ আমাদের সাবধান করেছেন, যেন আমরা সতর্কতার সাথে শব্দ উচ্চারণ করি। আমাদের কথাগুলো লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। যা কিছুই আমরা উচ্চারণ করব, তার দায়ভার কেবলই আমাদের।

পরম করুণাময় আল্লাহ বলেছেন, 'এটা জ্ঞান আহরণ ও স্মরণ করার মতো ব্যাপার প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জন্য।' -সূরা ক্বাফ:৮

আমাদের প্রিয় নবিজিও এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক করে গিয়েছেন, 'একটি শব্দই কাউকে জাহান্নামের অতল গহ্বরে পৌঁছে দিতে পারে।' [১]

নবিজি আরো বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দা কখনো এমন কথা উচ্চারণ করে, যা তার অজান্তেই আল্লাহর ভালো লাগে। প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আবার বান্দা কখনো নিজের অজান্তেই এমন কথা উচ্চারণ করে, যা আল্লাহকে রাগান্বিত করে এবং সে জাহান্নামে যাবে।' ২৯

কুরআন ও সুন্নাহতে নিজের জিহ্বা ও কথার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা সম্পূর্ণ বিষয় তুলে ধরতে পারব না। তবে পূর্বে উল্লেখিত বিষয়গুলোই কথা ও জিহ্বার নিরাপত্তার গুরুত্ব বোঝাতে যথেষ্ট।

সে একজন ব্যক্তির কথা দিয়েই তার পরিচয় পাওয়া যায়। এ কারণেই তার কথা বলার শিষ্টাচার থেকেই বোঝা যায় তাদের পরিবারের ধর্ম, সংস্কার ও বোঝাপড়া কেমন। এমন অনেক উপায় আছে যা ভাষার বিকাশ ঘটাতে সহায়ক, কথা বলার আচার-আচরণ শিখতে খুবই উপযোগী। আমরা সংক্ষেপে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরলাম

> সবসময় সত্য কথা বলার চেষ্টা করতে হবে। মজা করে মিথ্যা বলা, অতিরঞ্জিত শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়। আমরা কখনো এমন কথা বলব না যা অন্যের মনে ভয় সৃষ্টি করে।

> গিবত করা, মিথ্যা অপবাদ ও অভিশাপ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। কাউকে ব্যঙ্গ করে ডাকা, অপমানজনক নামে ডাকা মারাত্মক গুনাহের কাজ। শব্দ, কথা ও কাজে কাউকে কষ্ট দেওয়া যাবে না।

> কথায় কথায় কসম কাটা খুবই বাজে একটি অভ্যাস।

> এমন কোনো ঠাট্টা-মশকরা করা যাবে না, যেখানে শিষ্টাচার লঙ্ঘিত হয় কিংবা শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

> অবৈধ ও অশ্লীল আলোচনা থেকে বিরত থাকতে হবে।

» আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলা কমিয়ে আনতে হবে। শুদ্ধ ও প্রমিত ভাষার ব্যবহার শিখতে হবে।

» কাউকে অনুকরণ করতে গেলে অবশ্যই সর্বোত্তম ব্যক্তিকেই অনুকরণ করা উচিত। তুলনা করার ক্ষেত্রে অবশ্যই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে।

» কোনো মানুষের বর্ণনা দেওয়ার সময় কখনো তাকে কোনো প্রাণীর সাথে তুলনা করা যাবে না।

> কথার মাঝখানে নোংরা শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। গালিগালাজ করে কাউকে অপমান করা একটি গর্হিত কাজ।

> প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত কথা বলা কখনো কল্যাণ বয়ে আনে না। যারা বেশি কথা বলে, মানুষ তাদেরকে বাচাল বলে। অত্যধিক কথা বলা এড়িয়ে চলতে হবে আমাদের।

> কারো সাথে আলোচনায় থাকলে, কথার ফাঁকে অথবা তাদের সম্বোধন করতে গেলে তাদের জন্য দুআ করা যেতে পারে। যেমন: আল্লাহ আপনাকে হিদায়াত দান করুন, আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, মহান আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন, আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘায়ু দান করুন ইত্যাদি।

> মানুষকে পছন্দের নাম ধরে ডাকা অথবা যে নামে সমাজে সে পরিচিত, সেই নাম ব্যবহার করাই উচিত। যেমন: ইঞ্জিনিয়ার রফিক, ডাক্তার ভাই, প্রফেসর সাহেব ইত্যাদি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এই ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন।

> সম্মান ও ভালোবাসা প্রদর্শিত হয় এমন শব্দ ব্যবহার করা। যেমন: আমি আপনার সাথে আছি, আমি আপনার সেবায় নিয়োজিত ইত্যাদি।

> কথা বলার সময় দুঃখিত, ধন্যবাদ, জাযাকাল্লাহ-অর্থাৎ পরিস্থিতি বিচারে যতটা বিনয়ী হওয়া যায় সেরকম কোমল ও সুন্দর শব্দের ব্যবহার করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

> কারো ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করার আগে দু-বার ভেবে নিতে হবে, অপর ৬৫

মানুষটি এই কথাটা শুনে কীভাবে নেবে? সে কি কষ্ট পাবে? নাকি সে নিজেকে শোধরাতে পারবে?

তাড়াহুড়ো করা, চিৎকার করা ও উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা এড়িয়ে যেতে হবে।

কোনো কথা শুনে তা যাচাই না করে সেই কথা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। কোনো কথা শুনে তার সত্যতা যাচাইয়ের পর সেভাবেই কাজ করা উচিত।

> আমার ধারণা, আমার মনে হয়, আমার দৃষ্টিতে... ইত্যাদি কথার মাধ্যমে নিজের অনন্যতার প্রশংসা করা হয়। যেসব শব্দ দিয়ে নিজের প্রশংসা ও গর্ব প্রকাশিত হয়, সেসব শব্দ পরিহার করাই ভালো।

> কারো বক্তব্যকে অতিরঞ্জিত করা যাবে না। এতে কথা তার নিজস্ব অর্থ হারিয়ে ফেলে।

» প্রচলিত, অপ্রচলিত ও বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলোর অর্থ নিশ্চিত হয়ে সেই শব্দ ব্যবহার করা উচিত।

> বাচ্চারা ধীরে ধীরে কথা বলা শেখে। বাবা-মায়ের উচিত ভাষা শেখার ক্ষেত্রে তাদের সন্তানদের সহযোগিতা করা ও সবসময় উৎসাহ দেওয়া। সময়ের সাথে সাথে তাদের কথার ভুল শুধরে দেওয়াটাও খুব জরুরি।

এমন আরো অনেক বিষয় আছে, যেসব বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি। কিন্তু বইটিকে সংক্ষিপ্ত করার কারণে আমরা কিছু সীমিত মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করলাম।

মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনিই সর্বজ্ঞানী।

[১]সহিহ বুখারী ৬৪৭৭
(২)সহিহ বুখারী ৬৪৭৮

পরিবার গঠনের নেপথ্যে যারা:

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক তাদের পারিবারিক জীবনের ধরন নির্ধারণ করে। সমঝদার দম্পতি সবসময়ই বাড়ির পরিবেশকে প্রফুল্ল রাখতে পারে। আর এভাবেই পরিবারের ভিত্তি দৃঢ় ও মজবুত হয়। বাবা-মায়ের মধ্যকার ভালোবাসা ও বোঝাপড়ার একটি দীর্ঘস্থায়ী ছাপ সন্তানদের মধ্যেও পড়ে। কারণ বাবা-মায়ের মধ্য দিয়ে শিশুরা বোঝাপড়া শেখে। পরবর্তীকালে এই শিক্ষা কাজে লাগিয়ে নিজের জীবনসঙ্গীর সাথে আদর্শ পরিবার গড়তে পারবে। বাবার সাথে মায়ের আচরণ দেখেই মেয়ে শিখবে-কীভাবে স্বামীর সাথে ব্যবহার করতে হয়। আর পুরুষরাও স্ত্রীর সাথে যেমন ব্যবহার করে, তা মূলত তার বাবা-মায়ের সম্পর্কেরই প্রতিফলন। বিয়েতে খুব প্রচলিত একটি প্রথা দেখা যায়, বিয়ের সময় মেয়ের মা-খালা-বোন-মামা-চাচা ইত্যাদি আত্মীয়স্বজনদের খোঁজখবর নেয় পাত্রপক্ষ। এটা প্রমাণিত যে, মেয়েরা মায়ের স্বভাব-চরিত্রই পেয়ে থাকে।

মা-বাবার মধ্যকার ভালোবাসা ও বোঝাপড়া, এগুলোই তারা উত্তরাধিকারসূত্রে সন্তানদের জন্য রেখে যেতে পারেন।

বাবা-মায়ের মাঝে ভালোবাসা ও বোঝাপড়া গড়ে তোলার জন্য নিচের বিষয়গুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে-

কেউ যদি শুধু নিজের আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা পূরণ এবং আত্মসন্তুষ্টির জন্য বিয়ে করে, তাহলে সেই বিয়ে বিফলে যাবে। সে কখনোই বিয়ের মর্ম বুঝবে না। একটি পরিবার ধরে রাখার জন্য কী ত্যাগ ও উদারতার দরকার হয়, তা কখনোই সে জানতে পারবে না। বিয়ে মানেই কেউ কিছু চাইলে নিজের সবটুকু দিয়ে দেওয়া নয়।

» সামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালো বোঝাপড়া তৈরির লক্ষ্যে উভয়েরই উচিত একে অপরকে শ্রদ্ধা করা। কোনো ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য সম্মান না দিয়েও কেউ যদি দাবি করেন, তিনি তাকে শ্রদ্ধা করেন, তবে ওই দাবির কোনো মূল্য থাকে না।

স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি সম্মান থাকার অর্থ হলো একে অন্যের মতামতকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা।

> একটি শান্তিপূর্ণ পরিবারে একসাথে বসবাসের মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে-পরিবারের সদস্যদের আচার-আচরণ খেয়াল করে সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এটা তখনই সম্ভব, যখন কেউ নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে সর্বদা চিন্তা করে।

> নারী-পুরুষের মধ্যকার আসল সম্পর্ক হলো আত্মিক সম্পর্ক। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে থাকবে অন্তরঙ্গ যোগাযোগ। যদি নারী-পুরুষের মধ্যে ভাসাভাসা ও আপাতসম্পর্ক থাকে, তবে সেই সম্পর্ক ভঙ্গুর হয়। সময়ের সাথে সাথে বিলীন হয়ে যায় এমন সম্পর্ক।

> একটি পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই কিছু নিজস্ব চাহিদা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। স্ত্রীর সাথে সর্বোত্তম সম্পর্ক তৈরি করার জন্য স্বামীকে শিখতে হবে স্ত্রীর প্রয়োজনে কীভাবে তাকে সাহায্য করা যায়। যতটা সম্ভব স্ত্রীর ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। স্বামীর হস্তক্ষেপে স্ত্রীর কী প্রতিক্রিয়া হয়, তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনের সময় প্রিয়জনের সাহায্যই মানুষ আশা করে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ আমাদের কারোরই কাম্য নয়।

>> স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বৈষম্য ও মতবিরোধ থাকলে তাদের উচিত খুব তাড়াতাড়ি এর সমাধানে আসা। দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকা মতভেদ ও ঝগড়া পরিবারের জন্য ভালো নয়।

শিক্ষা ও চর্চার ধারাবাহিকতা:

মহামহিম আল্লাহর রহমত ও করুণায়, আমাদের অধিকাংশ পরিবারই ধর্মানুরাগী। কিছু পরিবার তো শুধু ধার্মিক ও ভালো কাজের প্রতি মনোযোগীই নয়; বরং নেককাজ ও দ্বীনদারিতার ব্যাপারেও অত্যন্ত চিন্তাশীল। তবে দুর্ভাগ্যবশত আজকাল অনেক পরিবারেই একে অপরের মধ্যে আত্মিক হৃদ্যতার অভাব লক্ষ করা যায়। বাবা-মা তাদের নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। অন্যদিকে ছেলেমেয়েরাও ব্যস্ত থাকছে নিজেদের নিয়ে। তারা হয়তো অবসরে টেলিভিশনে নিমগ্ন অথবা মোবাইল-ইন্টারনেট নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে ঘর থেকেই বেরোচ্ছে না কিংবা বন্ধুদের সাথে আড্ডাবাজি করে সময় কাটাচ্ছে। এমন চলতে থাকলে অচিরেই বাড়িগুলো হোটেলে পরিণত হবে, যেখানে সবাই যার যার ইচ্ছামতো চলবে। সন্তান-লালনপালনে অবশ্যই এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। পরিবারের সবার সাথে ভালো যোগাযোগের কারণে সন্তান-লালনপালনে অপরিসীম সুবিধা পাওয়া যায়। অবশ্যই এর ইতিবাচক প্রভাব অপরিসীম। এতে আত্মীয়তার বন্ধন আরো মজবুত হয়।

পরিবারে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য পারিবারিক ঐক্য মজবুত করতে যথাযং ব্যবস্থা নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নোক্ত উপায়ে পারিবারিক সম্পর্ক আরো দৃঢ় করা সম্ভব-

> পরিবারের সবাইকে নিয়ে মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। তাঁর ইবাদত করা। আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু যখনই সম্পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তিলাওয়াত শেষে পরিবারের সবাইকে একত্র করে দুআ করতেন। কুরআন তিলাওয়াত শেষ হয়েছে, এই উপলক্ষ্যে তারা দুআ করতেন।[১] এই দৃষ্টান্ত আমরা নিজেদের পরিবারেও প্রয়োগ করতে পারি।

> বাচ্চাদের ভালো ভালো, শিক্ষামূলক, অর্থবোধক ও ইসলামি কবিতা পড়তে দিন। কেউ যদি লেখালেখিতে আগ্রহী হয়, তাকে উৎসাহ জোগান। এতে তাদের মধ্যে ভালো কাজের প্রতিযোগিতা বাড়বে।

> যাদের জন্য মসজিদে গিয়ে জামাআতে সালাত পড়া বাধ্যতামূলক নয়, তারা বাড়িতে সম্মিলিতভাবে সালাত আদায় করতে পারে। এতে তাদের মাঝে ঐক্য গড়ে উঠবে, সম্পর্ক আরো মজবুত হবে। এ ছাড়াও তারা সবাই মিলে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে পারে। ফিকহের গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায়, জামাআতবদ্ধ হয়ে তাহাজ্জুদ আদায় করা জায়িয।

» ব্যক্তি, গোষ্ঠী, পরিবার ও সম্প্রদায়ের ওপর আমাদের কিছু সম্মিলিত দায়িত্ব আছে। ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায়ের দিকে সহযোগিতার হাত এগিয়ে দিতে হবে। এতে করে আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব দূর হবে।

> সন্তানদের যোগাযোগ, সম্বোধন, কারো সান্নিধ্যে আসা ও কথা শোনার ভদ্রতা শেখাতে হবে।

> পারিবারিক আলোচনা ও বিতর্কের আয়োজন করা যেতে পারে। সন্তানকে গল্প বলতে দেওয়া যেতে পারে। অথবা কোনো বইয়ের পর্যালোচনা করতে বলা যায়। তাদের গল্প ও পর্যালোচনা পরিবারের সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে। এর ফলে পারিবারিক ঐক্য মজবুত হয়ে উঠবে।

> পরিবারের সবাই মিলে বইয়ের দোকানে যেতে পারলে খুব ভালো। বিশেষ করে, পরিবারের জন্য উপকারী বই কিনতে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

> পরিবারের সদস্যদের আগ্রহের সাথে মানানসই খেলাধুলা ও বিনোদনের আয়োজন করা উচিত। এতে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক আরো জোরালো হবে।

এই পদ্ধতিগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করলে পরিবারের ঐক্য, তৃপ্তি ও অন্যান্য সুবিধাগুলো দ্বিগুণ আকারে পাওয়া যাবে।

পরিবারে বরকতের কুরআনিক দোয়া:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً

طيبة إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

হে আমার রব। আমাকে তোমার নিকট হতে কোনো পবিত্র সন্তান দান করো। নিশ্চয়ই তুমি দুয়া শ্রবণকারী! (আলে-ইমরান 38)

٥ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ

ذريتي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

আমার রব! আমাকে নামায কায়েম কারী বানিয়ে নিন এবং আমার আওলাদ দের মধ্য হতেও এমন লোক সৃষ্টি করুন, যারা নামাজ কায়েম করবে। হে রব! আমার দুয়া কবুল করে নিন (সূরা ইবরহীম 40)

٣رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاهَا جِنَا وَ ذرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

হে আমার রব। আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের পক্ষ হতে দান করুন নয়ন প্রীতি ও আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানাও (সূরা ফুরকান 74)

رب أوزعني أن أشكر نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَكَ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ
لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْك
وإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

হে আমার রব! আমাকে তাওফীক দান করুন, যেন আপনি আমাকে এবং আমার পিতামাতাকে যে নিআমত দিয়েছেন তার শোকর আদায় করতে পারি, যাতে আপনি খুশি হোন এবং আমার জন্য আমার সন্তানদেরকেও সেই যোগ্যতা দান করুন । আমি তওবা করছি এবং আমি আনুগত্য প্রকাশকারীদের অন্তভুক্ত।

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِين

হে আমার রব! আমাকে একা রেখা দিও না আর তুমিই শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী। (সূরা আম্বিয়া 89)

رَب هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

'ইয়া রব! আমাকে নেককার সন্তান দান করন (সূরা সফফাত 100)

هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا

ইয়া রব, আপনি আমাকে এক উত্তরা-ধিকারী দান করুন। (সূরা মারইয়াম ৫)

এটা দুয়া নয় বরং আবদার, আমার রবের নিকট-

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْ خُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّار

(অর্থাৎ) স্থায়ীভাবে অবস্থানের সেই উদ্যান সমূহ। যার ভেতর তারা নিজেরা ও প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদাগণ ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেককার হবে, তারাও। আর (তাদের অভ্যর্থনায়) ফেরেশতাগণ তাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে আর বলবে তোমরা দুনিয়াতে যে সবর অবলম্বন করিছিলে, তার বদৌলতে এখন তোমাদের প্রতি কেবল শান্তিই হবে এবং তোমাদের প্রকৃত নিবাসে বর্ষিত হবে এবং এটা কতই না উৎকৃষ্ট পরিণাম।-সূরা রাদ ২৩

তত্ত্বসূত্র:

১.পারিবারিক সম্পর্কের বুনন-প্রফেসর ড.আব্দুল করিম বাক্কার

২.সুখী পরিবার নির্মাণের রূপ রেখা-প্রফেসর ড.আব্দুল করিম বাক্কার

৩.মিশন ইসলাম-ড.শামসুল আরেফিন শক্তি

৪.তারবিয়াতুল আউলাদ -সাঈদ ইবনে আলী কাহতানি রহ.

৫.আদর্শ দ্বীনি পরিবার -সায়্যিদা মুহতারমা খাইরুন্নেছা

৬.পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণ -শায়েখ মুহাম্মদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ

৬.মাসিক আল কাউসার

৭.ইসলাম হাউজ.কম